সাহিত্যমেলা

বাংলা । অষ্টম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৪
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
পঞ্চম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক
অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

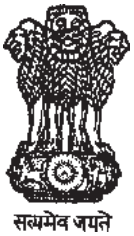

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

অষ্টম শ্রেণির জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যের বই 'সাহিত্যমেলা' প্রকাশ করা হলো। বাংলা ভাষাসাহিত্য পাঠ যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেকথা সকলেই স্বীকার করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার মধ্যেই বিষয়ের সার্থকতা। বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিকে একত্রিত করা হয়েছে 'সাহিত্যমেলা' বইটিতে। বইটি তাই বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯ – এই নথিদুটিকে নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী 'সাহিত্যমেলা' বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রেরণা জোগাতে বাংলা বিষয়টিকে সহজ ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত মানসম্পন্ন বইয়ের প্রয়োজন ছিল। এই বইটিতে তথ্যের ভার যাতে সাহিত্যের প্রকাশ ক্ষমতাকে কোনোভাবেই খর্ব না করে সেই দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠক্রমের মূল বিষয়গুলি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা হয় তার জন্য বইটিকে যথাসম্ভব প্রাঞ্জলভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বইটির একটিই উদ্দেশ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের কল্পনাশক্তি বিকশিত করা এবং লেখার ক্ষমতাকে উৎসাহিত করা।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রেমী মানুষ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

'সাহিত্যমেলা' বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়

ডিসেম্বর, ২০১৭
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬

প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক- এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের 'বাংলা' বইয়ের নাম 'সাহিত্যমেলা'। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা অনুযায়ী প্রতি শ্রেণির নতুন বইয়েরই একটি নির্দিষ্ট 'ভাবমূল' (theme) আছে। অষ্টম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ভাবমূল হলো 'বন্ধুত্ব ও সমানুভূতি'। নয়টি পর্বে বিন্যস্ত এই পাঠ্যপুস্তক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বাংলার প্রথিতযশা সাহিত্যকারদের রচনায়। অন্যদিকে, অনুবাদের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সাহিত্যিকের রচনা এবং ভারতীয় সাহিত্য, অর্থাৎ এদেশের অন্যান্য রাজ্যের সাহিত্যিকদের সৃষ্টি। বন্ধুত্ব ও সমানুভূতির নানান অভিমুখ আর তার বিচিত্র প্রকাশ ধরা পড়েছে লেখাগুলির মাধ্যমে। প্রতিটি পর্বে পাশাপাশি আছে একাধিক সমধর্মী বা সমবিষয়-কেন্দ্রিক রচনা। এই সজ্জার ধরনটি শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। 'হাতেকলমে' বিভাগে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সক্রিয়তা-নির্ভর শিখনের সম্ভার। অষ্টম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাবর্ষে নতুন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী একটি আলাদা দ্রুতপঠন পুস্তক হিসেবে সংযোজিত হলো প্রখ্যাত লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের সম্পাদিত রূপ 'ছোটোদের পথের পাঁচালী'। সেই বইটিতেও রয়েছে কল্পনার রঙিন পরিসর। উপরন্তু, আমরা চেয়েছি উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী একটি গোটা বই পড়ার সামর্থ্য এবং অভিজ্ঞতার দিকে যেন এগোতে পারে। এই দুটি পুস্তকই নতুন শিক্ষাবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের সহায়তায় রাজ্যের শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

অষ্টম শ্রেণির 'সাহিত্যমেলা' বইটিকে রঙে-রেখায় অপূর্ব সৌন্দর্যে অলংকৃত করে দিয়েছেন বেশ কয়েকজন বরেণ্য শিল্পী। তাঁদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটির শেষে 'শিখন পরামর্শ' সংযোজিত হলো। আমাদের বিশ্বাস এই অংশটি শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেবে। আশা করি, বইগুলি রাজ্যের শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামগ্রী হিসেবে গৃহীত হবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডিসেম্বর, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন, ষষ্ঠতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)
ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় রুদ্রশেখর সাহা মিথুন নারায়ণ বসু
স্বাতী চক্রবর্তী অপূর্ব সাহা ইলোরা ঘোষ মির্জা

সহযোগিতা

মণিকণা মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ

দেবব্রত ঘোষ

অলংকরণ

যুধাজিৎ সেনগুপ্ত প্রণবেশ মাইতি দেবব্রত ঘোষ
অলয় ঘোষাল শংকর বসাক সুব্রত মাজী

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

হিরণ লাইব্রেরি
উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি
রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা
জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা
বিদ্যাসাগর পত্রপত্রিকা সংগ্রহশালা, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন

সূচিপত্র

প্রথম পাঠ

পৃষ্ঠা

১

বোঝাপড়া
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অদ্ভুত আতিথেয়তা
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রাণ ভরিয়ে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চন্দ্রগুপ্ত
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিতীয় পাঠ

পৃষ্ঠা

২১

বনভোজনের ব্যাপার
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মিলিয়ে পড়ো
নিখিল-বঙ্গ-কবিতা-সংঘ
নলিনী দাশ

সবুজ জামা
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিঠি
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মিলিয়ে পড়ো
আলাপ
পূর্ণেন্দু পত্রী

তৃতীয় পাঠ

পৃষ্ঠা

৪৯

পরবাসী
বিষ্ণু দে

পথচল্‌তি
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

একটি চড়ুই পাখি
তারাপদ রায়

চতুর্থ পাঠ

পৃষ্ঠা ৬২

দাঁড়াও
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পল্লীসমাজ
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছন্নছাড়া
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গাঁয়ের বধূ
সলিল চৌধুরী

পঞ্চম পাঠ

পৃষ্ঠা ৮৩

গাছের কথা
জগদীশচন্দ্র বসু

হাওয়ার গান
বুদ্ধদেব বসু

কী করে বুঝব
আশাপূর্ণা দেবী

ষষ্ঠ পাঠ

পৃষ্ঠা ১০৩

পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি
জীবনানন্দ দাশ

আষাঢ়ের কোন ভেজা পথে
বিজয় সরকার

নাটোরের কথা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিলিয়ে পড়ো
স্বাদেশিকতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গড়াই নদীর তীরে
জসীমউদ্দীন

সপ্তম পাঠ

পৃষ্ঠা ১১৯

জেলখানার চিঠি
সুভাষচন্দ্র বসু

স্বাধীনতা
ল্যাংস্টন হিউজ

আদাব
সমরেশ বসু

ভয় কি মরণে
মুকুন্দদাস

শিকল-পরার গান
কাজী নজরুল ইসলাম

অষ্টম পাঠ

পৃষ্ঠা ১৪৩

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মিলিয়ে পড়ো
ভালোবাসা কি বৃথা যায়?
শিবনাথ শাস্ত্রী

ঘুরে দাঁড়াও
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সুভা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবম পাঠ

পৃষ্ঠা ১৬৪

পরাজয়
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

মাসিপিসি
জয় গোস্বামী

টিকিটের অ্যালবাম
সুন্দর রামস্বামী

লোকটা জানলই না
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বই পড়ার কায়দা-কানুন ৪

শিখন পরামর্শ

পৃষ্ঠা ১৯২

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

অলংকরণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত প্রণবেশ মাইতি
দেবব্রত ঘোষ অলয় ঘোষাল শংকর বসাক সুব্রত মাজী

বোঝাপড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।
কেউ বা তোমায় ভালোবাসে
কেউ বা বাসতে পারে না যে
কেউ বিকিয়ে আছে, কেউ বা
সিকি পয়সা ধারে না যে,
কতকটা যে স্বভাব তাদের
কতকটা বা তোমারো ভাই,
কতকটা এ ভবের গতিক—
সবার তরে নহে সবাই।
তোমায় কতক ফাঁকি দেবে
তুমিও কতক দেবে ফাঁকি,
তোমার ভোগে কতক পড়বে
পরের ভোগে থাকবে বাকি,
মান্ধাতারই আমল থেকে
চলে আসছে এমনি রকম—
তোমারি কি এমন ভাগ্য
বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম!
মনেরে আজ কহ যে,

ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।
অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি
এলে সুখের বন্দরেতে,
জলের তলে পাহাড় ছিল
লাগল বুকের অন্দরেতে,
মুহূর্তেকে পাঁজরগুলো
উঠল কেঁপে আর্তরবে—
তাই নিয়ে কি সবার সঙ্গে
ঝগড়া করে মরতে হবে?
ভেসে থাকতে পারো যদি
সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়,
না পারো তো বিনা বাক্যে
টুপ করিয়া ডুবে যেয়ো।

এটা কিছু অপূর্ব নয়,
ঘটনা সামান্য খুবই—
শঙ্কা যেথায় করে না কেউ
সেইখানে হয় জাহাজ-ডুবি।
মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।
তোমার মাপে হয়নি সবাই।
তুমিও হওনি সবার মাপে,
তুমি মর কারও ঠেলায়
কেউ বা মরে তোমার চাপে—
তবু ভেবে দেখতে গেলে
এমনি কিসের টানাটানি?
তেমন করে হাত বাড়ালে

সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।
আকাশ তবু সুনীল থাকে,
মধুর ঠেকে ভোরের আলো,
মরণ এলে হঠাৎ দেখি
মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।
যাহার লাগি চক্ষু বুজে
বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি
বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।
মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।
নিজের ছায়া মস্ত করে
অস্তাচলে বসে বসে
আঁধার করে তোলো যদি
জীবনখানা নিজের দোষে,
বিধির সঙ্গে বিবাদ করে
নিজের পায়েই কুড়ুল মারো,
দোহাই তবে এ কার্যটা
যত শীঘ্র পারো সারো।
খুব খানিকটে কেঁদে কেটে
অশ্রু ঢেলে ঘড়া ঘড়া
মনের সঙ্গে এক রকমে
করে নে ভাই, বোঝাপড়া।
তাহার পরে আঁধার ঘরে
প্রদীপখানি জ্বালিয়ে তোলো—
ভুলে যা ভাই, কাহার সঙ্গে
কতটুকুন তফাত হলো।
মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

হাতে কলমে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত *ভারতী* ও *বালক* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। *কথাকাহিনী*, *সহজপাঠ*, *রাজর্ষি*,*ছেলেবেলা*, *শিশু*, *শিশু ভোলানাথ*, *হাস্যকৌতুক*, *ডাকঘর* প্রভৃতি রচনা শিশু ও কিশোর মনকে আলোড়িত করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। ১৯১৩ সালে *Song Offerings*-এর জন্য এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা। পাঠ্য কবিতাটি তাঁর *ক্ষণিকা* কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১.১ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত কোন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়মিত লিখতেন?

১.২ ভারতের কোন প্রতিবেশী দেশে তাঁর লেখা গান জাতীয় সংগীত হিসাবে গাওয়া হয়?

২. নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :

২.১ ‘সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়।’ — কোনটি সবার চেয়ে শ্রেয়?

২.২ ‘ঘটনা সামান্য খুবই।’ — কোন ঘটনার কথা বলা হয়েছে?

২.৩ ‘তেমন করে হাত বাড়ালে / সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।’ — উদ্ধৃতিটির নিহিতার্থ স্পষ্ট করো।

২.৪ ‘মরণ এলে হঠাৎ দেখি / মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।’ — ব্যাখ্যা করো।

২.৫ ‘তাহারে বাদ দিয়েও দেখি / বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।’ — উদ্ধৃতিটির মধ্য দিয়ে জীবনের কোন সত্য প্রকাশ পেয়েছে?

২.৬ কীভাবে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে?

২.৭ ‘দোহাই তবে এ কার্যটা /যত শীঘ্র পারো সারো।’ — কবি কোন কার্যের কথা বলেছেন? সেই কার্যটি শীঘ্র সারতে হবে কেন?

২.৮ কখন আঁধার ঘরে প্রদীপ জ্বালানো সম্ভব?

২.৯ ‘ভুলে যা ভাই, কাহার সঙ্গে / কতটুকুন তফাত হলো।’ — এই উদ্ধৃতির মধ্যে জীবনের চলার ক্ষেত্রে কোন পথের ঠিকানা মেলে?

২.১০ ‘অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি / এলে সুখের বন্দরেতে,’ — ‘ঝঞ্ঝা কাটিয়ে আসা’ বলতে কী বোঝো?

শব্দার্থ : মান্ধাতার আমল — রাবণরাজার সমসাময়িক মান্ধাতার যুগ বা অতি প্রাচীনকাল। আর্তরবে — কাতর ধ্বনিতে। শ্রেয় — সংগত, উপযুক্ত। ডাগর — দীর্ঘ, বড়ো।

৩. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৩.১ 'ভালো মন্দ যাহাই আসুক / সত্যেরে লও সহজে।' — তুমি কি কবির সঙ্গে একমত? জীবনে চলার পথে নানা বাধাকে তুমি কীভাবে অতিক্রম করতে চাও?

৩.২ 'মনেরে আজ কহ যে, / ভালো মন্দ যাহাই আসুক / সত্যেরে লও সহজে।' — কবির মতো তুমি কি কখনও মনের সঙ্গে কথা বলো? সত্যকে মেনে নেবার জন্য মনকে তুমি কীভাবে বোঝাবে — একটি পরিস্থিতি কল্পনা করে বুঝিয়ে লেখো।

৩.৩ 'তেমন করে হাত বাড়ালে / সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।' — 'তেমন করে' কথাটির অর্থ বুঝিয়ে দাও। এখানে কবি কী ধরনের সুখের ইঙ্গিত করেছেন — লেখো।

৪. নীচের শব্দগুলির দল বিশ্লেষণ করে মুক্ত দল ও রুদ্ধ দল চিহ্নিত করো :

বোঝাপড়া, কতকটা, সত্যেরে, পাঁজরগুলো, বিশ্বভুবন, অশ্রুসাগর।

৫. নীচের প্রতিটি শব্দের তিনটি করে সমার্থক শব্দ লেখো :

মন, জখম, ঝঞ্ঝা, ঝগড়া, সামান্য, শঙ্কা, আকাশ।

৬. নীচের প্রতিটি শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ দিয়ে শব্দজোড় তৈরি করে বাক্য রচনা করো :

আঁধার, সত্য, দোষ, আকাশ, সুখ।

অদ্ভুত আতিথেয়তা

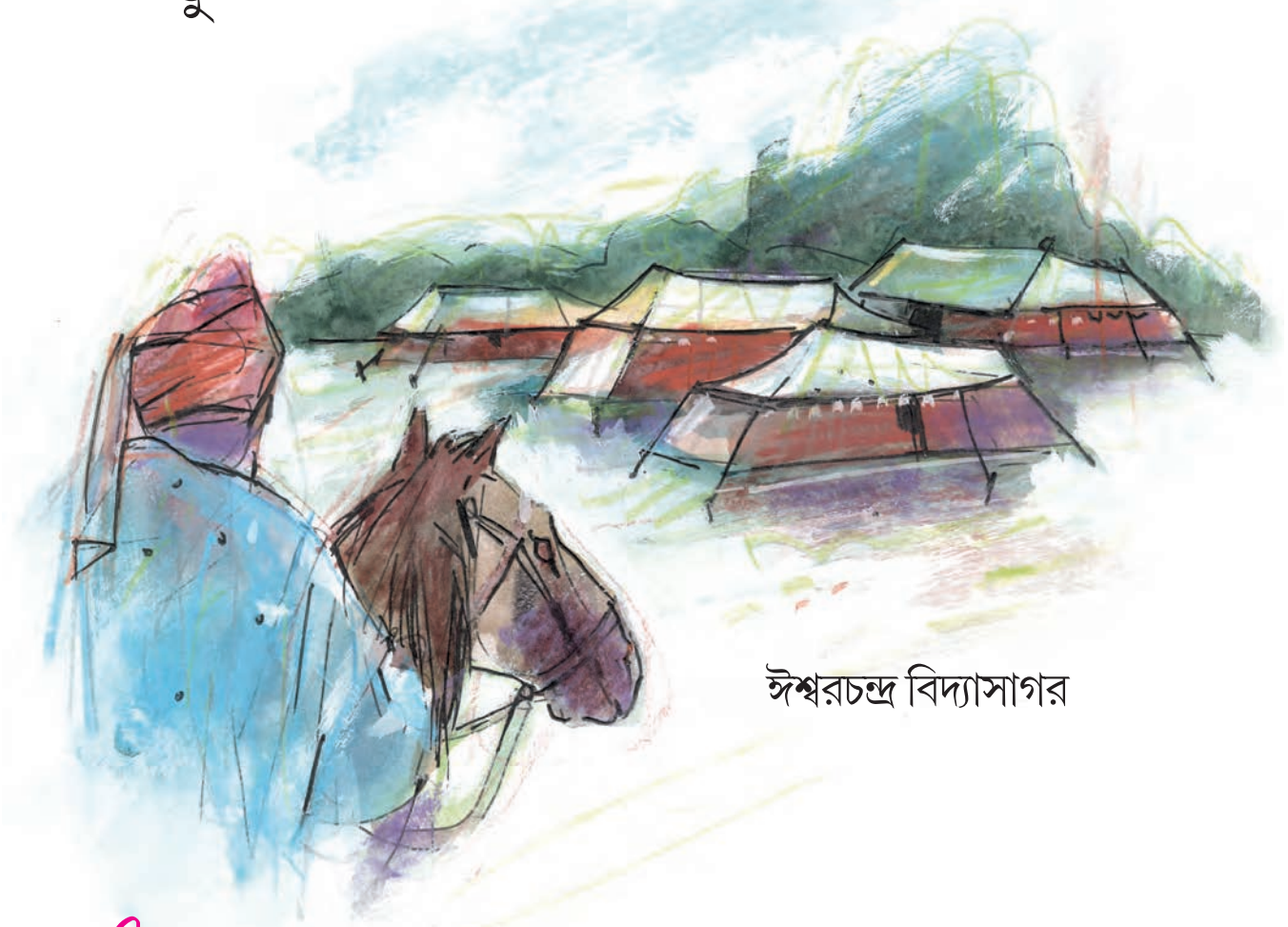

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

একদা আরব জাতির সহিত মুরদিগের সংগ্রাম হইয়াছিল। আরবসেনা বহুদূর পর্যন্ত এক মুরসেনাপতির অনুসরণ করে; তিনি অশ্বারোহণে ছিলেন, প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। আরবেরা তাঁহার অনুসরণে বিরত হইলে, তিনি স্বপক্ষীয় শিবিরের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দিক্‌ভ্রম জন্মিয়াছিল, এজন্য, দিক্‌নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তিনি বিপক্ষের শিবিরসন্নিবেশস্থানে উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে তিনি এরূপ ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে, আর কোনো ক্রমেই অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতে পারেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি, এক আরবসেনাপতির পটমণ্ডপদ্বারে উপস্থিত হইয়া, আশ্রয়-প্রার্থনা করিলেন। আতিথেয়তা বিষয়ে পৃথিবীতে কোনো জাতিই আরবদিগের তুল্য নহে। কেহ অতিথিভাবে আরবদিগের আলয়ে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সাধ্যানুসারে তাহার পরিচর্যা করেন; সে ব্যক্তি শত্রু হইলেও, অণুমাত্র অনাদর, বিদ্বেষপ্রদর্শন বা বিপক্ষতাচরণ করেন না।

আরবসেনাপতি তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত আশ্রয় প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত অভিভূত দেখিয়া, আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিলেন।

মুরসেনাপতি ক্ষুন্নিবৃত্তি পিপাসাশান্তি ও ক্লান্তিপরিহার করিয়া উপবিষ্ট হইলে, বন্ধুভাবে উভয় সেনাপতির কথোপকথন হইতে লাগিল। তাঁহারা, পরস্পর স্বীয় ও স্বীয় পূর্বপুরুষদিগের সাহস, পরাক্রম, সংগ্রামকৌশল প্রভৃতির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, সহসা আরবসেনাপতির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান ও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং কিঞ্চিৎ পরেই মুরসেনাপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন আমার অতিশয় অসুখবোধ হইয়াছে, এজন্য আমি উপস্থিত থাকিয়া, আপনকার পরিচর্যা করিতে পারিলাম না; আহারসামগ্রী ও শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি আহার করিয়া শয়ন করুন। আর, আমি দেখিলাম, আপনকার অশ্ব যেরূপ ক্লান্ত ও হতবীর্য হইয়াছে, তাহাতে আপনি কোনোক্রমেই নিরুদ্‌বেগে ও নিরুপদ্রবে স্বীয় শিবিরে পঁহুছিতে পারিবেন না। অতি প্রত্যুষে, এক দ্রুতগামী তেজস্বী অশ্ব, সজ্জিত হইয়া, পটমণ্ডপের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিবেক; আমিও সেই সময়ে আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং যাহাতে আপনি সত্বর প্রস্থান করিতে পারেন, তদ্‌বিষয়ে যথোপযুক্ত আনুকূল্য করিব।

কী কারণে আরবসেনাপতি এরূপ বলিয়া পাঠাইলেন, তাহার মর্মগ্রহ করিতে না পারিয়া, মুরসেনাপতি, আহার করিয়া, সন্দিহানচিত্তে শয়ন করিলেন। রজনীশেষে, আরব সেনাপতির লোক তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করাইল, এবং কহিল, আপনকার প্রস্থানের সময় উপস্থিত, গাত্রোত্থান ও মুখপ্রক্ষালনাদি করুন, আহার প্রস্তুত। সেনাপতি শয্যা পরিত্যাগ পূর্বক, মুখপ্রক্ষালনাদি সমাপন করিয়া, আহারস্থানে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেখানে আরবসেনাপতিকে দেখিতে পাইলেন না; পরে, দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি সজ্জিত অশ্বের মুখরশ্মি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।

আরবসেনাপতি দর্শনমাত্র, সাদর সম্ভাষণ করিয়া, মুরসেনাপতিকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন, এবং কহিলেন, আপনি সত্বর প্রস্থান করুন; এই বিপক্ষশিবির-মধ্যে, আমা অপেক্ষা আপনকার ঘোরতর বিপক্ষ আর নাই। গত রজনীতে, যৎকালে, আমরা উভয়ে, একাসনে আসীন হইয়া, অশেষবিধ কথোপকথন করিতেছিলাম, আপনি, স্বীয় ও স্বীয় পূর্বপুরুষদিগের বৃত্তান্তবর্ণন করিতে করিতে, আমার পিতার প্রাণহন্তার নির্দেশ করিয়াছিলেন। আমি শ্রবণমাত্র, বৈরসাধন বাসনার বশবর্তী হইয়া, বারংবার এই শপথ ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সূর্যোদয় হইলেই প্রাণপণে পিতৃহন্তার প্রাণবধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। এখন পর্যন্ত সূর্যের উদয় হয় নাই, কিন্তু উদয়েরও অধিক বিলম্ব নাই; আপনি সত্বর প্রস্থান করুন। আমাদের জাতীয় ধর্ম এই, প্রাণান্ত ও সর্বস্বান্ত হইলেও, অতিথির অনিষ্টচিন্তা করি না। কিন্তু আমার পটমণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেই, আপনকার অতিথিভাব অপগত হইবেক এবং সেই মুহূর্ত অবধি, আপনি স্থির জানিবেন, আমি আপনকার প্রাণসংহারের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন ও অশেষ প্রকারে চেষ্টা পাইব। এই যে অপর অশ্ব সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে দেখিতেছেন, সূর্যোদয় হইবামাত্র, আমি উহাতে আরোহণ করিয়া, বিপক্ষভাবে

আপনকার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু আমি আপনাকে যে অশ্ব দিয়াছি, উহা আমার অশ্ব অপেক্ষা কোনো অংশেই হীন নহে; যদি উহা দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের উভয়ের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।

এই বলিয়া, আরবসেনাপতি, সাদর সম্ভাষণ ও করমর্দন পূর্বক, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। আরবসেনাপতিও, সূর্যোদয়দর্শনমাত্র, অশ্বে আরোহণ করিয়া, তদীয় অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মুরসেনাপতি কতিপয় মুহূর্ত পূর্বে প্রস্থান করিয়াছিলেন, এবং তদীয় অশ্বও বিলক্ষণ সবল ও দ্রুতগামী। এজন্য, তিনি নির্বিঘ্নে স্বপক্ষীয় শিবিরসন্নিবেশস্থানে উপস্থিত হইলেন। আরবসেনাপতি, সবিশেষ যত্ন ও নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে, তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে স্বপক্ষশিবিরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, এবং অতঃপর আর বৈরসাধন সংকল্প সফল হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া, স্বীয় শিবিরে প্রতিগমন করিলেন।

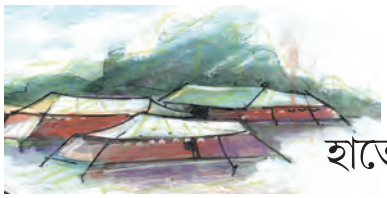

হাতেকলমে

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১) : জন্ম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে। বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে *বিদ্যাসাগর* উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ছাড়াও বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ-রোধ ইত্যাদি বহুবিধ সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত মৌলিক ও অনূদিত বহু গ্রন্থের মধ্যে *আখ্যানমঞ্জরী, বোধোদয়, ঋজুপাঠ, কথামালা , বর্ণ পরিচয়, বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব, প্রভাবতী সম্ভাষণ* উল্লেখযোগ্য। পাঠ্য আখ্যানটি তাঁর *আখ্যানমঞ্জরী* গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১.১ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন?

১.২ তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থের নাম লেখো।

২. নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও:

২.১ ‘অদ্ভুত আতিথেয়তা’ গল্পে কোন কোন সেনাপতির প্রসঙ্গ রয়েছে?

২.২ ‘তিনি, এক আরবসেনাপতির পটমণ্ডপদ্বারে উপস্থিত হইয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন।’ — উদ্ধৃতাংশে ‘তিনি’ বলতে কার কথা বোঝানো হয়েছে?

২.৩ ‘উভয় সেনাপতির কথোপকথন হইতে লাগিল।’ — ‘উভয় সেনাপতি’ বলতে এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে?

২.৪ ‘তাহা হইলে আমাদের উভয়ের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।’ — প্রাণরক্ষার কোন উপায় বক্তা এক্ষেত্রে বলেছেন?

২.৫ ‘আপনি সত্বর প্রস্থান করুন।’ — বক্তা কেন উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে ‘সত্বর প্রস্থান’ করার নির্দেশ দিলেন?

৩. নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর লেখো:

৩.১ ‘তাঁহার দিক্‌ভ্রম জন্মিয়াছিল।’ — এখানে কার কথা বলা হয়েছে? দিক্‌ভ্রম হওয়ার পরিণতি কী হলো?

৩.২ ‘আতিথেয়তা বিষয়ে পৃথিবীতে কোনও জাতিই আরবদিগের তুল্য নহে।’ — এই বক্তব্যের সমর্থন গল্পে কীভাবে খুঁজে পেলে?

৩.৩ ‘সহসা আরবসেনাপতির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।’ — আরবসেনাপতির মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে ওঠার কারণ কী?

৩.৪ ‘সন্দিহানচিত্তে শয়ন করিলেন।’ — এখানে কার মনের সন্দেহের কথা বলে হয়েছে? তাঁর মনের এই সন্দেহের কারণ কী?

৩.৫ ‘... তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল...’ — কে, কাকে অনুসরণ করছিলেন? তাঁর এই অনুসরণের কারণ কী?

৪. প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো :

৪.১ ‘যাহাতে আপনি সত্বর প্রস্থান করিতে পারেন, তদ্‌বিষয়ে যথোপযুক্ত আনুকূল্য করিব।’

৪.২ ‘এই বিপক্ষ শিবির-মধ্যে, আমা অপেক্ষা আপনকার ঘোরতর বিপক্ষ আর নাই।’

৪.৩ ‘আমাদের জাতীয় ধর্ম এই, প্রাণান্ত ও সর্বস্বান্ত হইলেও, অতিথির অনিষ্টচিন্তা করি না।’

৫. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৫.১ গল্পে কার আতিথেয়তার কথা রয়েছে? তিনি কীভাবে অতিথির আতিথেয়তা করেন? তাঁর সেই আতিথেয়তাকে 'অদ্ভুত' আখ্যা দেওয়া হয়েছে কেন?

৫.২ আরব - মুর সংঘর্ষের ইতিহাসাশ্রিত কাহিনি অবলম্বনে রচিত এই আখ্যানে লেখকের রচনাশৈলীর অনন্যতার পরিচয় দাও।

৫.৩ 'আতিথেয়তা বিষয়ে পৃথিবীর কোনও জাতিই আরবদিগের তুল্য নহে।' — গল্পের ঘটনা বিশ্লেষণ করে মন্তব্যটির যথার্থতা প্রতিপন্ন করো।

৫.৪ 'বন্ধুভাবে উভয় সেনাপতির কথোপকথন হইতে লাগিল।' — কোন দুই সেনাপতির কথা এখানে বলা হয়েছে? তাঁদের কীভাবে সাক্ষাৎ ঘটেছিল? উভয়ের কথোপকথনের সারমর্ম নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

৫.৫ 'তিনি নির্বিঘ্নে স্বপক্ষীয় শিবিরসন্নিবেশ স্থানে উপস্থিত হইলেন।' — কার কথা বলা হয়েছে? কীভাবে তিনি স্বপক্ষের শিবিরে নির্বিঘ্নে পৌঁছলেন? তাঁর জীবনের এই ঘটনার পূর্বরাত্রের অভিজ্ঞতার কথা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

৫.৬ 'তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন...' —কার কথা বলা হয়েছে? তিনি কাকে অনুসরণ করছিলেন? তাঁর এই অনুসরণের কারণ কী? শত্রুকে কাছে পেয়েও তিনি 'বৈরসাধন সংকল্প' সাধন করেননি কেন?

শব্দার্থ : বৈরসাধন —শত্রুতা। স্বপক্ষীয় — নিজের দলের। পটমণ্ডপদ্বারে — তাঁবুর (বস্ত্রদ্বারা নির্মিত) দরজায়। বিপক্ষতাচরণ — বিপক্ষের মতো আচরণ। ক্ষুন্নিবৃত্তি — ক্ষুধার নিবৃত্তি। গাত্রোত্থান — উঠে দাঁড়ানো। মর্মগ্রহ—তাৎপর্যবোধ। মুখপ্রক্ষালনাদি — মুখ ধোওয়া ইত্যাদি।

৬. **নীচের শব্দগুলির দলবিশ্লেষণ করে মুক্তদল ও রুদ্ধদল চিহ্নিত করো :**

সংগ্রাম, অশ্বপৃষ্ঠ, দণ্ডায়মান, করমর্দন , তৎক্ষণাৎ

৭. **নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :**

৭.১ আরবেরা তাঁহার অনুসরণে বিরত হইলে, তিনি স্বপক্ষীয় শিবিরের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। (জটিল বাক্যে)

৭.২ আতিথেয়তা বিষয়ে পৃথিবীতে কোনও জাতিই আবরদিগের তুল্য নহে। (ইতিবাচক বাক্যে)

৭.৩ দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি সজ্জিত অশ্বের মুখরশ্মি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। (যৌগিক বক্যে)

৭.৪ এই বিপক্ষশিবির-মধ্যে, আমা অপেক্ষা আপনকার ঘোরতর বিপক্ষ আর নাই। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

৭.৫ তিনি নির্বিঘ্নে স্বপক্ষীয় শিবিরসন্নিবেশস্থানে উপস্থিত হইলেন। (না-সূচক বাক্যে)

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।
তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান॥
আরো আলো আরো আলো
এই নয়নে প্রভু, ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশি পূরে
তুমি আরো আরো আরো দাও তান।।
আরো বেদনা আরো বেদনা,
প্রভু, দাও মোরে আরও চেতনা
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে
মোরে করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ।
আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে।
সুধাধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো করো দান॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : বাংলাভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার এবং সুরকার। তাঁর রচিত গানগুলি 'গীতিবতান' নামের বইতে কয়েক খণ্ডে বিধৃত রয়েছে। আর গানগুলির স্বরলিপি বিভিন্ন খণ্ডে রয়েছে 'স্বরবিতান' নামের বইয়ে।

চন্দ্রগুপ্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

স্থান — সিন্ধু-নদতট; দূরে গ্রিক জাহাজ-শ্রেণি। কাল — সন্ধ্যা।

নদতটে শিবির-সম্মুখে সেকেন্দার ও সেলুকস অস্তগামী সূর্যের দিকে চাহিয়া ছিলেন। হেলেন সেলুকসের হস্ত ধরিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। সূর্যরশ্মি তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল।

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস! কী বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘন-কৃষ্ণ মেঘরাশি গুরুগম্ভীর গর্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মতো এর আকাশ ছেয়ে আসে; আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদী-তুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদ-নদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি স্বেচ্ছাচারের মতো তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা করছে।

সেলুকস। সত্য সম্রাট।

সেকেন্দার। কোথাও দেখি, তালীবন গর্বভরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও বিরাট বট স্নেহছায়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গমপর্বতসম মন্থর গমনে চলেছে; কোথাও মহাভুজঙ্গম অলস হিংসার মতো বক্র রেখায় পড়ে আছে; কোথাও বা মহাশৃঙ্গ কুরঙ্গম মুগ্ধ বিস্ময়ের মতো নির্জন বনমধ্যে শূন্য-প্রেক্ষণে চেয়ে আছে। আর সবার উপরে এক সৌম্য, গৌর, দীর্ঘ-কান্তি জাতি এই দেশ শাসন করছে, তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস। এ শৌর্য পরাজয় করে আনন্দ আছে। পুরুকে বন্দি করে আনি যখন — সে কি বললে জানো?

সেলুকস। কী সম্রাট?

সেকেন্দার। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার কাছে কীরূপ আচরণ প্রত্যাশা করো?' — সে নির্ভীক নিষ্কম্পস্বরে উত্তর দিল, 'রাজার প্রতি রাজার আচরণ!' চমকিত হলাম! ভাবলাম — এ একটা জাতি বটে! আমি তৎক্ষণাৎ তাকে তার রাজ্য প্রত্যর্পণ করলাম।

সেলুকস। সম্রাট মহানুভব।

সেকেন্দার। মহানুভব! তার পরে তার সঙ্গে অন্যরূপ ব্যবহার সম্ভব? মহৎ কিছু দেখলেই একটা উল্লাস আসে। আর আমি এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে আসি নাই। আমি এসেছি শৌখিন দিগ্‌বিজয়ে। জগতে একটা কীর্তি রেখে যেতে চাই।

সেলুকস। তবে এ দিগ্‌বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে যাচ্ছেন কেন সম্রাট?

সেকেন্দার। সে দিগ্‌বিজয় সম্পূর্ণ করতে হলে নূতন গ্রিক সৈন্য চাই। — কী আশ্চর্য সেনাপতি! দূর মাসিডন থেকে রাজ্য, জনপদ তৃণসম পদতলে দলিত করে চলে এসেছি! ঝঞ্ঝার মতো এসে মহাশত্রুসৈন্য ধূমরাশির মতো উড়িয়ে দিয়েছি। অর্ধেক এশিয়া মাসিডনের বিজয়বাহিনীর বীরপদভরে কম্পিত হয়েছে। নিয়তির মতো দুর্বার, হত্যার মতো করাল, দুর্ভিক্ষের মতো নিষ্ঠুর আমি অর্ধেক এশিয়ার বক্ষের উপর দিয়ে আমার রুধিরাক্ত বিজয়-শকট অবাধে চালিয়ে গিয়েছি। কিন্তু বাধা পেলাম প্রথম — সেই শতদ্রুতীরে।

চন্দ্রগুপ্তকে ধরিয়া আন্টিগোনসের প্রবেশ।

সেকেন্দার। কী সংবাদ আন্টিগোনস? ও কে?

আন্টিগোনস। গুপ্তচর।

সেলুকস। সে কি!

সেকেন্দার। গুপ্তচর!

আন্টিগোনস। আমি দেখলাম যে এক শিবিরের পাশে বসে নির্জনে শুষ্ক তালপত্রে কী লিখছিল। আমি দেখতে চাইলাম। পত্রখানি দেখাল। পড়তে পারলাম না। — তাই সম্রাটের কাছে নিয়ে এসেছি।

সেকেন্দার। কী লিখছিলে যুবক? সত্য বলো।

চন্দ্রগুপ্ত। সত্য বলব। রাজাধিরাজ! ভারতবাসী মিথ্যা কথা বলতে এখনও শিখে নাই।

সেকেন্দার একবার সেলুকসের প্রতি চাহিলেন, পরে চন্দ্রগুপ্তকে কহিলেন —

সেকেন্দার। উত্তম। বলো কী লিখছিলে?

চন্দ্রগুপ্ত। আমি সম্রাটের বাহিনী-চালনা, ব্যূহ রচনা-প্রণালী, সামরিক নিয়ম, এই সব মাসাবধি কাল ধরে শিখছিলাম।

সেকেন্দার। কার কাছে?

চন্দ্রগুপ্ত। এই সেনাপতির কাছে।

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস?

সেলুকস। সত্য।

সেকেন্দার। [চন্দ্রগুপ্তকে] তার পর?

চন্দ্রগুপ্ত। তারপর গ্রিক সৈন্য কাল এ স্থান পরিত্যাগ করে যাবে শুনে, আমি যা শিখেছি তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম।

সেকেন্দার। কী অভিপ্রায়ে?

চন্দ্রগুপ্ত। সেকেন্দার সাহার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে নহে।

সেকেন্দার। তবে —

চন্দ্রগুপ্ত। তবে শুনুন সম্রাট। আমি মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত। আমার পিতার নাম মহাপদ্ম। আমার বৈমাত্র ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার করে আমায় নির্বাসিত করেছে। আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।

সেকেন্দার। তারপর!

চন্দ্রগুপ্ত। তারপর শুনলাম মাসিডন ভূপতির অদ্ভুত বিজয়বার্তা। অর্ধেক এশিয়া পদতলে দলিত করে নদনদীগিরি দুর্বার বিক্রমে অতিক্রম করে, শুনলাম তিনি ভারতবর্ষে এসে আর্যকুলরবি পুরুকে পরাজিত করেছেন। হে সম্রাট! আমার ইচ্ছা হলো যে দেখে আসি — কী সে পরাক্রম, যার ভ্রূকুটি দেখে, সমস্ত এশিয়া তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে; কোথায় সে শক্তি লুক্কায়িত আছে, আর্যের মহাবীর্যও যার সংঘাতে বিচলিত হয়েছে। তাই এখানে এসে সেনাপতির কাছে শিক্ষা করছিলাম। আমার ইচ্ছা, শুদ্ধ আমার হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করা। এই মাত্র।

সেকেন্দার সেলুকসের পানে চাহিলেন।

সেলুকস। আমি এরূপ বুঝি নাই। যুবকের চেহারা, কথাবার্তা আমার মিষ্ট লাগত। আমি সরলভাবে গ্রিক সামরিক প্রথা সম্বন্ধে যুবকের সঙ্গে আলোচনা করতাম। বুঝি নাই যে এ বিশ্বাসঘাতক?

আন্টিগোনস। কে বিশ্বাসঘাতক?

সেলুকস। এই যুবক।

আন্টিগোনস। এই যুবক, না তুমি?

সেলুকস। আন্টিগোনস? আমার বয়স না মানো, পদবি মেনে চলো।

আন্টিগোনস। জানি তুমি গ্রিক সেনাপতি, তা সত্ত্বেও তুমি বিশ্বাসঘাতক।

সেলুকস। আন্টিগোনস!

তরবারি বাহির করিলেন

আন্টিগোনস ক্ষিপ্রতর হস্তে তরবারি বাহির করিয়া সেলুকসের শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি ক্ষেপণ করিলেন। ততোধিক ক্ষিপ্রহস্তে চন্দ্রগুপ্ত নিজ তরবারি বাহির করিয়া সে আঘাত নিবারণ করিলেন। আন্টিগোনস তাঁহাকে ছাড়িয়া চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিলেন।

সেকেন্দার। নিরস্ত হও।

সেই মুহূর্তেই আন্টিগোনসের তরবারি চন্দ্রগুপ্তের তরবারির আঘাতে ভূপতিত হইল।

সেকেন্দার। আন্টিগোনস!

আন্টিগোনস লজ্জায় শির অবনত করিলেন।

সেকেন্দার। আন্টিগোনস! তোমার এই ঔদ্ধত্যের জন্য তোমায় আমার সাম্রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলাম। একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের এতদূর স্পর্ধা! — আমি এতক্ষণ বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়েছিলাম। তোমার এতদূর স্পর্ধা হতে পারে' তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। — যাও, এই মুহূর্তেই তোমায় নির্বাসিত করলাম।

[আন্টিগোনসের প্রস্থান]

সেকেন্দার। আর সেলুকস! তোমার অপরাধ তত নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে স্মরণ রেখো যে গ্রিক সম্রাটের সম্মুখে চক্ষু রক্তবর্ণ করা গ্রিক সেনাপতির শোভা পায় না — আর যুবক!

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট!

সেকেন্দার। তোমায় যদি বন্দি করি?

চন্দ্রগুপ্ত। কী অপরাধে সম্রাট?

সেকেন্দার। আমার শিবিরে তুমি শত্রুর গুপ্তচর হয়ে প্রবেশ করেছ, এই অপরাধে।

চন্দ্রগুপ্ত। এই অপরাধে!—ভেবেছিলাম যে সেকেন্দার সাহা বীর, দেখছি যে তিনি ভীরু। এক গৃহহীন নিরাশ্রয় হিন্দু রাজপুত্র ছাত্রহিসাবে তাঁর কাছে উপস্থিত, তাতেই তিনি ত্রস্ত। সেকেন্দার সাহা এত কাপুরুষ তা ভাবি নাই।

সেকেন্দার। সেলুকস! বন্দি করো।

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট আমায় বধ না করে বন্দি করতে পারবেন না।

তরবারি বাহির করিলেন

সেকেন্দার। [সোল্লাসে] চমৎকার! যাও আমি তোমায় বন্দি করব না। আমি পরীক্ষা করছিলাম মাত্র। নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও। আর আমি এক ভবিষ্যদ্‌বাণী করি, মনে রেখো। তুমি হৃত রাজ্য উদ্ধার করবে। তুমি দুর্জয় দিগ্‌বিজয়ী হবে। যাও বীর! মুক্ত তুমি।

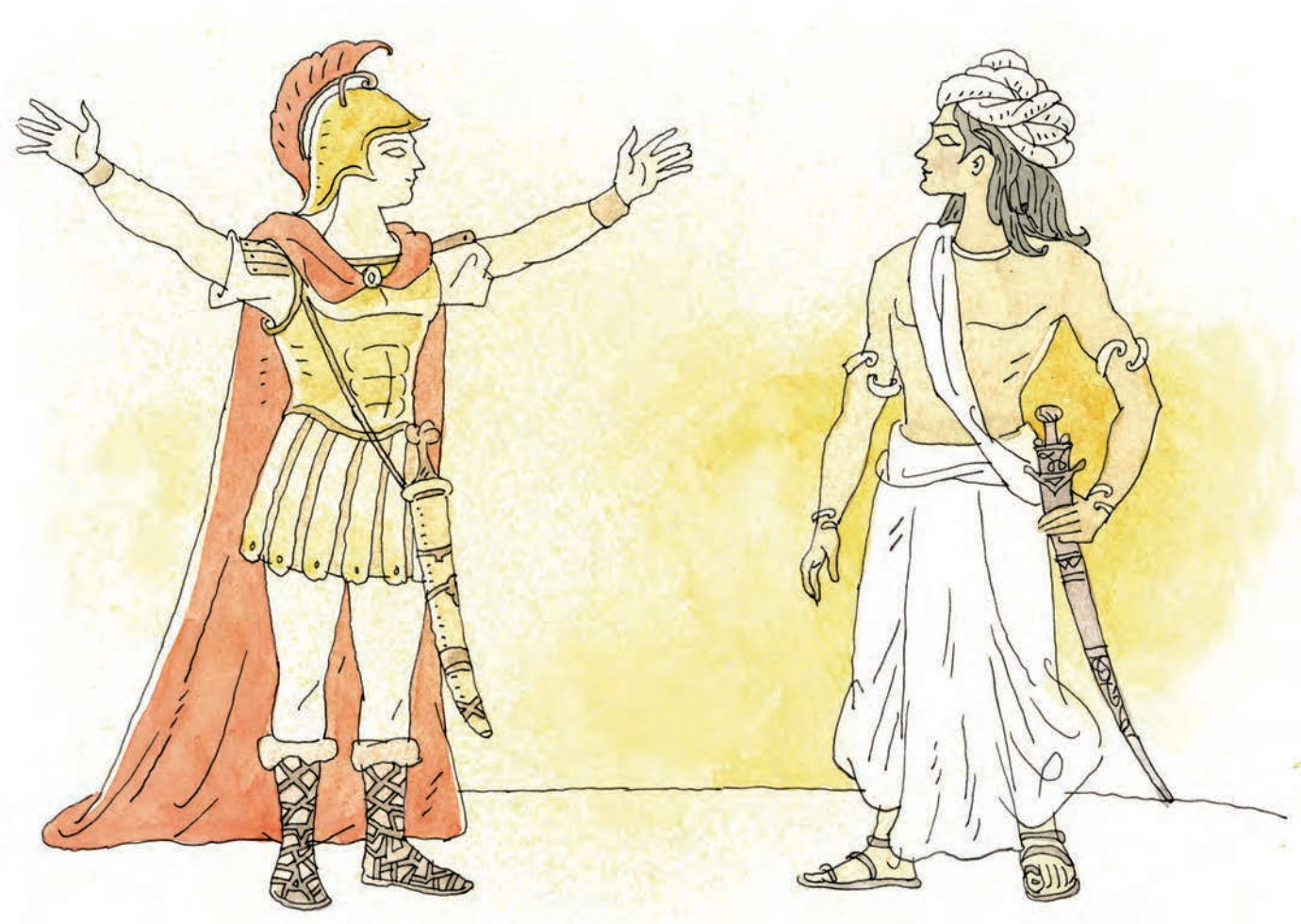

হাতে কলমে

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) : প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার। ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে এম. এ পাশ করেন। কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলেত গিয়েছিলেন। সেখানে পাশ্চাত্য সংগীত শেখেন। অল্প বয়সে কাব্যরচনা শুরু করে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রধানত কাব্যই রচনা করেন। জীবনের শেষ দশ বছর তিনি পৌরাণিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচনার মধ্যে *হাসির গান, চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, মেবার পতন, প্রতাপসিংহ, নূরজাহান, সীতা* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পাঠ্য নাট্যাংশটি তাঁর *চন্দ্রগুপ্ত* নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে নেওয়া হয়েছে।

১.১ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কৃষিবিদ্যা শেখার জন্য কোথায় গিয়েছিলেন?

১.২ তাঁর রচিত দুটি নাটকের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর একটি বাক্যে লেখো:**

২.১ নাট্যাংশটির ঘটনাস্থল ও সময় নির্দেশ করো।

২.২ নাট্যাংশে উল্লিখিত 'হেলেন' চরিত্রের পরিচয় দাও।

২.৩ 'রাজার প্রতি রাজার আচরণ।' — উদ্ধৃতাংশের বক্তা কে?

২.৪ 'জগতে একটা কীর্তি রেখে যেতে চাই' — বক্তা কীভাবে এই কীর্তি রেখে যেতে চান?

২.৫ 'সম্রাট, আমায় বধ না করে বন্দি করতে পারবেন না।' — বক্তাকে 'বন্দি' করার প্রসঙ্গ এসেছে কেন?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:**

৩.১ 'কী বিচিত্র এই দেশ!' — বক্তার চোখে এই দেশের বৈচিত্র্য কীভাবে ধরা পড়েছে?

৩.২ ভাবলাম — এ একটা জাতি বটে!' — বক্তা কে? তাঁর এমন ভাবনার কারণ কী?

৩.৩ 'এ দিগ্‌বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে যাচ্ছেন কেন সম্রাট?' — এ প্রশ্নের উত্তরে সম্রাট কী জানালেন?

৩.৪ 'ভারতবাসী মিথ্যা কথা বলতে এখনও শিখে নাই।' — বক্তা কে? কোন সত্য সে উচ্চারণ করেছে?

৩.৫ 'আমার ইচ্ছা হলো যে দেখে আসি...' — বক্তার মনে কোন ইচ্ছে জেগে উঠেছিল? তার পরিণতিই বা কী হয়েছিল?

৪. **নীচের উদ্ধৃত অংশগুলির প্রসঙ্গ ও তাৎপর্য আলোচনা করো :**

৪.১ 'এ শৌর্য পরাজয় করে আনন্দ আছে।'

৪.২ 'সম্রাট মহানুভব'।

৪.৩ 'বাধা পেলাম প্রথম — সেই শতদ্রুতীরে।'

৪.৪ 'আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।'

৪.৫ 'যাও বীর! মুক্ত তুমি।'

৫. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৫.১ নাট্যাংশটি অবলম্বনে ঐতিহাসিক নাটকের পরিবেশ সৃষ্টিতে নাট্যকারের দক্ষতার পরিচয় দাও।

৫.২ নাট্যাংশে 'সেকেন্দার' ও 'সেলুকস'-এর পরিচয় দাও। সেকেন্দারের সংলাপে ভারত-প্রকৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ কীভাবে ধরা দিয়েছে, তা বিশ্লেষণ করো।

৫.৩ 'চমকিত হলাম।' — কার কথায় বক্তা চমকিত হয়েছিলেন? তাঁর চমকিত হওয়ার কারণ কী?

৫.৪ 'সম্রাট মহানুভব।' — বক্তা কে? সম্রাটের 'মহানুভবতা'-র কীরূপ পরিচয় নাট্যাংশে পাওয়া যায়?

৫.৫ ইতিহাসের নানান অনুষঙ্গ কীভাবে নাট্যকলেবরে বিধৃত রয়েছে তা ঘটনাধারা বিশ্লেষণ করে আলোচনা করো।

৫.৬ 'গুপ্তচর।' — কাকে 'গুপ্তচর' আখ্যা দেওয়া হয়েছে? সে কি প্রকৃতই গুপ্তচর?

৫.৭ 'সেকেন্দার একবার সেলুকসের প্রতি চাহিলেন...' — তাঁর এই ক্ষণেক দৃষ্টিপাতের কারণ কী?

৫.৮ চন্দ্রগুপ্ত সেলুকসের কীরূপ সম্বন্ধের পরিচয় নাট্যাংশে মেলে?

৫.৯ 'তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম।' — কার উক্তি? সে কী লিখে নিচ্ছিল? তাঁর এই লিখে নেওয়ার উদ্দেশ্য কী?

৫.১০ আন্টিগোনস নাটকের এই দৃশ্যে সেলুকসকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলেছে। তোমার কি সেলুকসকে সত্যিই 'বিশ্বাসঘাতক' বলে মনে হয়? যুক্তিসহ আলোচনা করো।

৫.১১ 'নিরস্ত্র হও।'— কে এই নির্দেশ দিয়েছেন? কোন পরিস্থিতিতে তিনি এমন নির্দেশ দানে বাধ্য হলেন?

৫.১২ 'আন্টিগোনস লজ্জায় শির অবনত করিলেন।' — তাঁর এহেন লজ্জিত হওয়ার কারণ কী?

৫.১৩ নাট্যাংশ অবলম্বনে গ্রিক সম্রাট সেকেন্দারের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের পরিচয় দাও।

৫.১৪ চন্দ্রগুপ্তের প্রতি সেকেন্দারের কীরূপ মনোভাবের পরিচয় নাট্যদৃশ্যে ফুটে উঠেছে, তা উভয়ের সংলাপের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

শব্দার্থ : শিবির — সেনানিবাস/ছাউনি। প্রাবৃটে — বর্ষাকালে। জঙ্গমপর্বতসম — গতিশীল পর্বতের মতো। মদমত্ত মাতঙ্গ — উন্মত্ত হাতি। মহাশৃঙ্গ কুরঙ্গম — বড়ো শিংওয়ালা হরিণ। শকট — যান / গাড়ি। বৈমাত্র — বিমাতার সন্তান।

৬. নীচের বাক্যগুলি থেকে সন্ধিবদ্ধ পদ খুঁজে নিয়ে সন্ধিবিচ্ছেদ করো :

৬.১ আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি।

৬.২ বিশাল নদ-নদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছুটেছে।

৬.৩ সে নির্ভীক নিষ্কম্পস্বরে উত্তর দিলো, 'রাজার প্রতি রাজার আচরণ।'

৬.৪ আমি এসেছি শৌখিন দিগ্‌বিজয়ে।

৬.৫ তুমি হৃতরাজ্য উদ্ধার করবে।

৭. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো :

দৈত্যসৈন্য, নদনদী, স্নেহছায়া, অসম্পূর্ণ, বিজয়বার্তা, অভ্রভেদী।

৮. ক্রিয়ার কাল নির্দেশ করো :

৮.১ হেলেন সেলুকসের হস্ত ধরিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা।

৮.২ এই মরুভূমি স্বেচ্ছাচারের মতো তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা করছে।

৮.৩ চমকিত হলাম।

৮.৪ আমার শিবিরে তুমি গুপ্তচর হয়ে প্রবেশ করেছ।

৮.৫ নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও।

৯. নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দগুলির কারক-বিভক্তি নির্দেশ করো :

৯.১ কী বিচিত্র এই দেশ!

৯.২ আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি।

৯.৩ মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গমপর্বতসম মন্থর গতিতে চলেছে।

৯.৪ বাধা পেলাম প্রথম-সেই শতদ্রুতীরে।

৯.৫ আমি যা শিখেছি তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম।

১০. নীচের শব্দগুলির দল বিশ্লেষণ করো :

স্থিরভাবে, নিষ্কম্পস্বরে, বিজয়বাহিনী, চন্দ্রগুপ্ত, আর্যকুলরবি।

১১. নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :

১১.১ নদতটে শিবির-সম্মুখে সেকেন্দার ও সেলুকস অস্তগামী সূর্যের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

(দুটি বাক্যে ভেঙে লেখো)।

১১.২ 'আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা করো?' (পরোক্ষ উক্তিতে)

১১.৩ জগতে একটা কীর্তি রেখে যেতে চাই। (না-সূচক বাক্যে)

১১.৪ আমি যা শিখেছি তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম। (সরল বাক্যে)

১১.৫ তোমার অপরাধ তত নয়। (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

১১.৬ এক গৃহহীন নিরাশ্রয় হিন্দু রাজপুত্র ছাত্র হিসেবে তাঁর কাছে উপস্থিত, তাতেই তিনি ত্রস্ত।

(নিম্নরেখ শব্দের বিশেষ্যরূপ ব্যবহার করে বাক্যটি লেখো)

১১.৭ 'কী বিচিত্র এই দেশ'! (নির্দেশক বাক্যে)

১১.৮ 'সত্য সম্রাট'। (না-সূচক বাক্যে)

১১.৯ এ দিগ্‌বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে যাচ্ছেন কেন সম্রাট? (পরোক্ষ উক্তিতে)

১১.১০ 'ভারতবাসী মিথ্যা কথা বলতে এখনও শিখে নাই।' (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

১১.১১ আমি এরূপ বুঝি নাই। (হ্যাঁ-সূচক বাক্যে)

১১.১২ 'সেকেন্দার সাহা এত কাপুরুষ তাহা ভাবি নাই।' (নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দের বিশেষ্যের রূপ ব্যবহার করো)

১১.১৩ সম্রাট আমায় বধ না করে বন্দি করতে পারবেন না। (যৌগিক বাক্যে)

১১.১৪ আমি পরীক্ষা করছিলাম মাত্র। (জটিল বাক্যে)

১১.১৫ 'নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও'। (না-সূচক বাক্যে)

বনভোজনের ব্যাপার

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

হাবুল সেন বলে যাচ্ছিল—পোলাও, ডিমের ডালনা, রুই মাছের কালিয়া, মাংসের কোর্মা—

উস-উস শব্দে নোলার জল টানল টেনিদা : বলে যা—থামলি কেন? মুর্গ মুসল্লম, বিরিয়ানি পোলাও, মশলদা দোসে, চাউ-চাউ, সামি কাবাব—

এবার আমাকে কিছু বলতে হয়। আমি জুড়ে দিলাম : আলু ভাজা, শুক্তো, বাটিচচ্চড়ি, কুমড়োর ছোকা—

টেনিদা আর বলতে দিলে না! গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল : থাম প্যালা, থাম বলছি। শুক্তো, বাটিচচ্চড়ি।—দাঁত খিঁচিয়ে বললে, তার চেয়ে বল-না হিঞ্চে সেদ্ধ, গাঁদাল আর শিঙিমাছের ঝোল! পালা-জ্বরে ভুগিস আর বাসক পাতার রস খাস, এর চাইতে বেশি বুদ্ধি আর কী হবে তোর! দিব্যি অ্যায়সা অ্যায়সা মোগলাই খানার কথা হচ্ছিল, তার মধ্যে ধাঁ করে নিয়ে এল বাটি চচ্চড়ি আর বিউলির ডাল! ধ্যাত্তোর!

ক্যাবলা বললে, পশ্চিমে কুঁদরুর তরকারি দিয়ে ঠেকুয়া খায়। বেশ লাগে!

—বেশ লাগে?—টেনিদা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল : কাঁচা লঙ্কা আর ছোলার ছাতু আরও ভালো লাগে না? তবে তাই খা-গে যা। তোদের মতো উল্লুকের সঙ্গে পিকনিকের আলোচনাও ঝকমারি!

হাবুল সেন বললেন, আহা-হা চৈইত্যা যাইত্যাছ কেন? পোলাপানে কয়—

— পোলাপান! এই গাড়লগুলোকে জলপান করলে তবে রাগ যায়! তাও কি খাওয়া যাবে এগুলোকে? নিম-নিসিন্দের চেয়েও অখাদ্য। এই রইল তোদের পিকনিক—আমি চললাম! তোরা ছোলার ছাতু আর কাঁচা লঙ্কার পিণ্ডি গেল গেয়ে—আমি ওসবের মধ্যে নেই!

সত্যিই চলে যায় দেখছি! আর দলপতি চলে যাওয়া মানেই আমরা একেবারে অনাথ! আমি টেনিদার হাত চেপে ধরলাম : আহা, বোসো-না। একটা প্ল্যান-ট্যান হোক। ঠাট্টাও বোঝো না।

টেনিদা গজগজ করতে লাগল : ঠাট্টা! কুমড়োর ছোকা আর কুঁদরুর তরকারি নিয়ে ওসব বিচ্ছিরি ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

—না,—না, ওসব কথার কথা—হাবুল সেন ঢাকাই ভাষায় বোঝাতে লাগল : মোগলাই খানা না হইলে আর পিকনিক হইল কী?

—তবে লিস্টি কর—টেনিদা নড়ে-চড়ে বসল।

প্রথমে যে লিস্টটা হলো তা এইরকম :

বিরিয়ানি পোলাও
কোর্মা
কোপ্তা
কাবাব (দু-রকম)
মাছের চপ

—মাঝখানে বেরসিকের মতো বাধা দিলে ক্যাবলা : তাহলে বাবুর্চি চাই, একটা চাকর, একটা মোটর লরি, দুশো টাকা—

—দ্যাখ ক্যাবলা—টেনিদা ঘুসি বাগাতে চাইল।

আমি বললাম, চটলে কী হবে? চারজনে মিলে চাঁদা উঠেছে দশ টাকা ছ-আনা।

টেনিদা নাক চুলকে বললে, তাহলে একটু কমসম করেই করা যাক। ট্যাঁক-খালির জমিদার সব—তোদের নিয়ে ভদ্দরলোকে পিকনিক করে!

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, তুমি দিয়েছ ছ-আনা, বাকি দশ টাকা গেছে আমাদের তিনজনের পকেট থেকে। কিন্তু বললেই গাঁট্টা। আর সে গাঁট্টা ঠাট্টার জিনিস নয়—জুতসই লাগলে স্রেফ গালপাট্টা উড়ে যাবে।

রফা করতে করতে শেষপর্যন্ত লিস্টটা যা দাঁড়াল তা এই :

খিচুড়ি (প্যালা রাজহাঁসের ডিম আনিবে বলিয়াছে)
আলু ভাজা (ক্যাবলা ভাজিবে)
পোনা মাছের কালিয়া (প্যালা রাঁধিবে)
আমের আচার (হাবুল দিদিমার ঘর হইতে হাতসাফাই করিবে)
রসগোল্লা, লেডিকেনি (ধারে 'ম্যানেজ' করিতে হইবে)

লিস্টি শুনে আমি হাঁড়িমুখ করে বললাম, ওর সঙ্গে আর-একটা আইটেম জুড়ে দে হাবুল। টেনিদা খাবে।

—হেঁ—হেঁ—প্যালার মগজে শুধু গোবর নেই, ছটাকখানেক ঘিলুও আছে দেখছি। বলেই টেনিদা আদর করে আমার পিঠ চাপড়ে দিলে। 'গেছি গেছি' বলে লাফিয়ে উঠলাম আমি।

আমরা পটলডাঙার ছেলে—কিছুতেই ঘাবড়াই না। চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে রোজ দু-বেলা আমরা গন্ডায়গন্ডায় হাতি-গন্ডার সাবাড় করে থাকি। তাই বেশ ডাঁটের মাথায় বলেছিলাম, দূর-দূর। হাঁসের ডিম খায় ভদ্দরলোক! খেতে হলে রাজহাঁসের ডিম। রীতিমতো রাজকীয় খাওয়া!

—কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে শুনি? খুব যে চালিয়াতি করছিস, তুই ডিম পাড়বি নাকি?—টেনিদা জানতে চেয়েছিল।

—আমি পাড়তে যাব কোন দুঃখে? কী দায় আমার?—আমি মুখ ব্যাজার করে বলেছিলাম : হাঁসে পাড়বে।

—তাহলে সেই হাঁসের কাছ থেকে ডিম তোকেই আনতে হবে। যদি না আনিস, তাহলে—

তাহলে কী হবে বলবার দরকার ছিল না। কিন্তু কী গেরো বলো দেখি। কাল রবিবার—ভোরের গাড়িতেই আমরা বেরুব পিকনিকে। আজকের মধ্যেই রাজহাঁসের ডিম জোগাড় করতে না পারলে তো গেছি। পাড়ায় ভন্টাদের বাড়ি রাজহাঁস আছে গোটাকয়েক। ডিম-টিমও তারা নিশ্চয় পাড়ে। আমি ভন্টাকেই পাকড়ালাম। কিন্তু কী খলিফা ছেলে ভন্টা! দু-আনার পাঁঠার ঘুগনি আর ডজনখানেক ফুলুরি সাবড়ে তবে মুখ খুলল!

—ডিম দিতে পারি, তবে, নিজের হাতে বার করে নিতে হবে বাক্স থেকে।

—তুই দে না ভাই এনে। একটা আইসক্রিম খাওয়াব। ভন্টা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, নিজেরা পোলাও-মাংস সাঁটাবেন আর আমার বেলায় আইসক্রিম! ওতে চলবে না। ইচ্ছে হয় নিজে বের করে নাও—আমি বাবা ময়লা ঘাঁটতে পারব না। কী করি, রাজি হতে হলো।

ভন্টা বললে, দুপুরবেলায় আসিস। বাবা-মেজদা অফিসে যাওয়ার পরে। মা তখন ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোয়। সেইসময় ডিম বের করে দেবো!

গেলাম দুপুরে। উঠোনের একপাশে কাঠের বাক্স—তার ভিতরে সার-সার খুপরি। গোটা-দুই হাঁস ভিতরে বসে ডিমে তা দিচ্ছে। ভন্টা বললে, যা—নিয়ে আয়।

কিন্তু কাছে যেতেই বিতিকিচ্ছিরিভাবে ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করে উঠল হাঁস দুটো।

ফোঁস-ফোঁস করছে যে!

ভন্টা উৎসাহ দিলে : ডিম নিতে এসেছিস—একটু আপত্তি করবে না? তোর কোনো ভয় নেই প্যালা—দে হাত ঢুকিয়ে।

হাত ঢুকিয়ে দেবো? কিন্তু কী বিচ্ছিরি ময়লা!—ময়লা আর কী বদখত গন্ধ! একেবারে নাড়ি উলটে আসে। তার ওপরে যে-রকম ঠোঁট ফাঁক করে ভয় দেখাচ্ছে—

ভন্টা বললে, চিয়ার আপ প্যালা। লেগে যা!

যা থাকে কপালে বলে যেই হাত ঢুকিয়েছি—সঙ্গে সঙ্গে—ওরে বাপরে! খটাং করে হাঁসটা হাত কামড়ে ধরল। সে কী কামড়! হাঁই-মাই করে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

—কী হয়েছে রে ভন্টা, নীচে এত গোলমাল কীসের?—ভন্টার মা-র গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

আমি আর নেই। হ্যাঁচকা টানে হাঁসের ঠোঁট থেকে হাত ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় লাগালাম। দরদর করে রক্ত পড়ছে তখন।

রাজহাঁস এমন রাজকীয় কামড় বসাতে পারে কে জানত। কিন্তু কী ফেরেববাজ ভন্টাটা। জেনে-শুনে ব্রাহ্মণের রক্তপাত ঘটাল। আচ্ছা—পিকনিকটা চুকে যাক—দেখে নেব তারপর। ওই পাঁঠার ঘুগনি আর ফুলুরির শোধ তুলে ছাড়ব।

কী করা যায়—গাঁটের পয়সা দিয়ে মাদ্রাজি ডিমই কিনতে হলো গোটাকয়েক।

পরদিন সকালে শ্যামবাজার ইস্টিশানে পৌঁছে দেখি, টেনিদা, ক্যাবলা আর হাবুল এর মধ্যেই মার্টিনের রেলগাড়িতে চেপে বসে আছে। সঙ্গে একরাশ হাঁড়ি-কলশি, চালের পুঁটুলি, তেলের ভাঁড়। গাড়িতে গিয়ে উঠতে টেনিদা হাঁক ছাড়ল : এনেছিস রাজহাঁসের ডিম?

দুর্গা নাম করতে করতে পুঁটলি খুলে দেখালাম।

—এর নাম রাজহাঁসের ডিম। ইয়ার্কি পেয়েছিস?—টেনিদা গাঁট্টা বাগাল।

আমি গাড়ির খোলা দরজার দিকে সরে গেলাম : মানে—ইয়ে, ছোটো রাজহাঁস কিনা—

—ছোটো রাজহাঁস! কী পেয়েছিস আমাকে শুনি? পাগল না পেটখারাপ?

হাবুল সেন বললে, ছাড়ান দাও—ছাড়ান দাও। ডিম তো আনছে!

টেনিদা গর্জন করে বললে, ডিম এনেছে না কচু। এই তোকে বলে রাখছি প্যালা—ডিমের ডালনা থেকে তোর নাম কেটে দিলাম। এক টুকরো আলু পর্যন্ত নয়, একটু ঝোলও নয়!

মন খারাপ করে আমি বসে রইলাম। ডিমের ডালনা আমি ভীষণ ভালোবাসি, তাই থেকেই আমাকে বাদ দেওয়া! আচ্ছা বেশ, খেয়ো তোমরা। এমন নজর দেবো পেট ফুলে ঢোল হয়ে যাবে তোমাদের।

পিঁ করে বাঁশি বাজল—নড়ে উঠল মার্টিনের রেল। তারপর ধ্বস-ধ্বস ভোঁস-ভোঁস করে এর রান্নাঘর, ওর ভাঁড়ারঘরের পাশ দিয়ে গাড়ি চলল।

টেনিদা বললে, বাগুইআটি ছাড়িয়ে আরও চারটে ইস্টিশান। তার মানে প্রায় এক ঘণ্টার মামলা। লেডিকেনির হাঁড়িটা বের কর, ক্যাবলা।

ক্যাবলা বললে, এখুনি! তাহলে পৌঁছোবার আগেই যে সাফ হয়ে যাবে?

টেনিদা বললে, সাফ হবে কেন, দুটো-একটা চেখে দেখব শুধু। আমার বাবা ট্রেনে চাপলেই খিদে পায়। এই একঘণ্টা ধরে শুধু শুধু বসে থাকতে পারব না। বের কর হাঁড়ি—চটপট—

হাঁড়ি চটপটই বেরুল—মানে, বেরুতেই হলো তাকে। তারপর মার্টিনের রেলের চলার তালে তালে ঝটপট করে সাবাড় হয়ে চলল। আমি, ক্যাবলা আর হাবুল সেন জুল-জুল করে শুধু তাকিয়েই রইলাম। একটা লেডিকেনি চেখে দেখতে আমরাও যে ভালোবাসি, সেকথা আর মুখ ফুটে বলাই গেল না।

ইস্টিশান থেকে নেমে প্রায় মাইলখানেক হাঁটবার পরে ক্যাবলার মামার বাড়ি। কাঁচা রাস্তা, এঁটেল মাটি, তার ওপর কাল রাতে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে আবার। আগে থেকেই রসগোল্লার হাঁড়িটা বাগিয়ে নিলে টেনিদা।

—এটা আমি নিচ্ছি। বাকি মোটঘাটগুলো তোরা নে।

—রসগোল্লা বরং আমি নিচ্ছি, তুমি চালের পোঁটলাটা নাও টেনিদা।

লেডিকেনির পরিণামটা ভেবে আমি বলতে চেষ্টা করলাম।

টেনিদা চোখ পাকাল : খবরদার প্যালা, ওসব মতলব ছেড়ে দে। টুপটাপ করে দু-চারটে গালে ফেলবার বুদ্ধি, তাই নয়? হুঁ-হুঁ বাবা—চালাকি ন চলিষ্যতি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাঁটরি-বোঁচকা কাঁধে ফেলে আমরা তিনজনেই এগোলাম।

কিন্তু তিন পাও যেতে হলো না। তার আগেই ধাঁই—ধপাস। টেনে একখানা রাম-আছাড় খেলো হাবুল।

—এই খেয়েছে কচুপোড়া।—টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল।

সারা গায়ে কাদা মেখে হাবুল উঠে দাঁড়াল। হাতের ডিমের পুঁটলিটা তখন কুঁকড়ে এতটুকু—হলদে রস গড়াচ্ছে তা থেকে।

ক্যাবলা বললে, ডিমের ডালনার বারোটা বেজে গেল।

তা গেল। করুণ চোখে আমরা তাকিয়ে রইলাম সেইদিকে। ইস—এত কষ্টের ডিম। ওরই জন্যে রাজহাঁসের কামড় পর্যন্ত খেতে হয়েছে।

টেনিদা হুংকার দিয়ে উঠল : দিলে সব পণ্ড করে। এই ঢাকাই বাঙালটাকে সঙ্গে এনেই ভুল হয়েছে। পিটিয়ে ঢাকাই পরোটা করলে তবে রাগ যায়।

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, হাবুল চার টাকা চাঁদা দিয়েছে—তার আগেই কী যেন একটা হয়ে গেল! হঠাৎ মনে হলো আমার পা দুটো মাটি ছেড়ে শোঁ করে শূন্যে উড়ে গেল, আর তারপরেই—

কাদা থেকে যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন আমার মাথা-মুখ বেয়ে আচারের তেল গড়াচ্ছে। ওই অবস্থাতেই চেটে দেখলাম একটুখানি। বেশ ঝাল-ঝাল টক-টক—বেড়ে আচারটা করেছিল হাবুলের দিদিমা!

ক্যাবলা আবার ঘোষণা করলে, আমের আচারের একটা বেজে গেল।

টেনিদা খেপে বললে, চুপ কর বলছি ক্যাবলা—এক চড়ে গালের বোম্বা উড়িয়ে দেবো।

কিন্তু তার আগেই টেনিদার বোম্বা উড়ল—মানে স্রেফ লম্বা হলো কাদায়। সাত হাত দূরে ছিটকে গেল রসগোল্লার হাঁড়ি—ধবধবে সাদা রসগোল্লাগুলো পাশের কাদাভরা খানায় গিয়ে পড়ে একেবারে নেবুর আচার।

ক্যাবলা বললে, রসগোল্লার দুটো বেজে গেল!

এবার আর টেনিদা একটা কথাও বললে না। বলবার ছিলই বা কী! রসগোল্লার শোকে বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে চারজনে পথ চলতে লাগলাম আমরা। টেনিদা তবু লেডিকেনিগুলো সাবাড় করেছে, কিন্তু আমাদের সান্ত্বনা কোথায়। অমন স্পঞ্জ রসগোল্লাগুলো।

পাঁচ মিনিট পরে টেনিদাই কথা কইল।

—তবু পোনা মাছগুলো আছে—কী বলিস! খিচুড়ির সঙ্গে মাছের কালিয়া আর আলুভাজা—নেহাত মন্দ হবে না—অ্যাঁ?

হাবুল বললে, হ-হ, সেই ভালো। বেশি খাইলে প্যাট গরম হইব। গুরুপাক না খাওয়াই ভালো।

ক্যাবলা মিটমিট করে হাসল: শেয়াল বলেছিল, দ্রাক্ষাফল অতিশয় খাট্টা।—ক্যাবলা ছেলেবেলায় পশ্চিমে ছিল, তাই দুই-একটা হিন্দি শব্দ বেরিয়ে পড়ে মুখ দিয়ে।

টেনিদা বলে খাট্টা! বেশি পাঁঠামি করবি তো চাঁট্টা বসিয়ে দেবো।

ক্যাবলা ভয়ে স্পিকটি নট। আমি তখনও নাকের পাশ দিয়ে ঝাল-ঝাল টক-টক তেল চাটছি। হঠাৎ বুক-পকেটটা কেমন ভিজে ভিজে মনে হলো। হাত দিয়ে দেখি, বেশ বড়োসড়ো এক-টুকরো আমের আচার তার ভেতরে কায়েমি হয়ে আছে।

—জয়গুরু! এদিক-ওদিক তাকিয়ে টপ করে সেটা তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলাম।

সত্যি—হাবুলের দিদিমা বেড়ে আচার করেছিল! আরো গোটাকয়েক যদি ঢুকত!

বাগানবাড়িতে পৌঁছোলাম আরো পনেরো মিনিট পরে।

চারিদিকে সুপুরি আর নারকেলের বাগান—একটা পানা-ভরতি পুকুর, মাঝখানে, একতলা বাড়িটা। কিন্তু ঘরে চাবিবন্ধ। মালিটা কোথায় কেটে পড়েছে, কে জানে!

টেনিদা বললে, কুছ পরোয়া নেই। চুলোয় যাক মালি। বলং বলং বাহুবলং—নিজেরা উনুন খুঁড়ব—খড়ি কুড়ুব, রান্না করব—মালি ব্যাটা থাকলেই তো ভাগ দিতে হতো। যা হাবুল ইট কুড়িয়ে আন—উনুন করতে হবে। প্যালা, কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে আয়,—ক্যাবলাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যা।

—আর তুমি?—আমি ফস করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম।

—আমি?—একটা নারকেল গাছে হেলান দিয়ে টেনিদা হাই তুলল : আমি এগুলো সব পাহারা দিচ্ছি। সবচাইতে কঠিন কাজটাই নিলাম আমি। শেয়াল কুকুর এলে তাড়াতে হবে তো।—যা তোরা—হাতে হাতে বাকি কাজগুলো চটপট সেরে আয়।

কঠিন কাজই বটে! ইস্কুলের পরীক্ষার গার্ডদেরও অমনি কঠিন কাজ করতে হয়। ত্রৈরাশিকের অঙ্ক কষতে গিয়ে যখন 'ঘোড়া-ঘোড়া ঘাস-ঘাস' নিয়ে আমাদের দম আটকাবার জো, তখন গার্ড মোহিনীবাবুকে টেবিলে পা তুলে দিয়ে 'ফোঁরর-ফোঁ' শব্দে নাক ডাকাতে দেখছি।

টেনিদা বললে, যা—যা সব—দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ঝাঁ করে রান্নাটা করে ফ্যাল—বড্ড খিদে পেয়েছে।

তা পেয়েছে বইকি। পুরো এক হাঁড়ি লেডিকেনি এখনও গজগজ করছে পেটের ভিতর। আমাদের বরাতেই শুধু অষ্টরম্ভা। প্যাঁচার মতো মুখ করে আমরা কাঠ খড়ি সব কুড়িয়ে আনলাম।

টেনিদা লিস্টি বার করে বললে, মাছের কালিয়া—প্যালা রাঁধিবে।

আমাকে দিয়েই শুরু। আমি মাথা চুলকে বললাম, খিচুড়ি-টিচুড়ি আগে হয়ে যাক—তবে তো?

—খিচুড়ি লাস্ট আইটেম—গরম গরম খেতে হবে। কালিয়া সকলের আগে। নে প্যালা—লেগে যা—

ক্যাবলার মা মাছ কেটে নুন-টুন মাখিয়ে দিয়েছিলেন, তাই রক্ষা। কড়াইতে তেল চাপিয়ে আমি মাছ ঢেলে দিলাম তাতে।

আরে—এ কী কাণ্ড! মাছ দেবার সঙ্গে সঙ্গে কড়াই-ভরতি ফেনা। তারপরেই আর কথা নেই—অতগুলো মাছ তালগোল পাকিয়ে গেল একসঙ্গে। মাছের কালিয়া নয়—মাছের হালুয়া।

ক্যাবলা আদালতের পেয়াদার মতো ঘোষণা করল : মাছের কালিয়ার তিনটে বেজে গেল।

—তবে রে ইস্টুপিড—। টেনিদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল : কাঁচা তেলে মাছ দিয়ে তুই কালিয়া রাঁধছিস? এবার তোর পালাজ্বরের পিলেরই একদিন কি আমারই একদিন।

এ তো মার্টিনের রেল নয়—সোজা মাঠের রাস্তা। আমার কান পাকড়াবার জন্যে টেনিদার হাতটা এগিয়ে আসবার আগেই আমি হাওয়া। একেবারে পাঞ্জাব মেলের স্পিডে।

টেনিদা চেঁচিয়ে বললে, খিচুড়ির লিস্ট থেকে প্যালার নাম কাটা গেল।

তা যাক। কপালে আজ হরিমটর আছে সে তো গোড়াতেই বুঝতে পেরেছি। গোমড়া মুখে একটা আমড়া-গাছতলায় এসে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম।

বসে বসে কাঠপিঁপড়ে দেখছি, হঠাৎ গুটি গুটি হাবুল আর ক্যাবলা এসে হাজির।

—কী রে, তোরাও?

ক্যাবলা ব্যাজার মুখে বললে, খিচুড়ি টেনিদা নিজেই রাঁধবে। আমাদের আরও খড়ি আনতে পাঠাল।

সেই মুহূর্তেই হাবুল সেনের আবিষ্কার! একেবারে কলম্বাসের আবিষ্কার যাকে বলে।

—এই প্যালা—দ্যাখছস? ওই গাছটায় কীরকম জলপাই পাকছে!

আর বলতে হলো না। আমাদের তিনজনের পেটেই তখন খিদেয় ইঁদুর লাফাচ্ছে। জলপাই—জলপাই-ই সই। সঙ্গে সঙ্গে আমরা গাছে উঠে পড়লাম—আহা—টক-টক—মিঠে-মিঠে জলপাই—যেন অমৃত।

হাবুলের খেয়াল হলো প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে।

—এই, টেনিদার খিচুড়ি কী হইল?

ঠিক কথা—খিচুড়ি তো এতক্ষণে হয়ে যাওয়া উচিত। তড়াক করে গাছ থেকে নেমে পড়ল ওরা। হাতের কাছে পাতা-টাতা যা পেলে, তাই নিয়ে ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে। আমিও গেলাম পেছনে পেছনে, আশায় আশায়। মুখে যাই বলুক—এক হাতা খিচুড়িও কি আমায় দেবে না? প্রাণ কি এত পাষাণ হবে টেনিদার?

কিন্তু খানিক দূরে এগিয়ে আমরা তিনজনেই থমকে দাঁড়ালাম। একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ!

টেনিদা সেই নারকেল গাছটায় হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে। আর মাঝে মাঝে বলছে, দে—দে ক্যাবলা, পিঠটা আর একটু ভালো করে চুলকে দে।

পিঠ চুলকে দিচ্ছে—সন্দেহ কী। কিন্তু সে ক্যাবলা নয়—একটা গোদা বানর। আর চার-পাঁচটা গোল হয়ে বসেছে টেনিদার চারিদিকে। কয়েকটা তো মুঠো-মুঠো চাল-ডাল মুখে পুরছে, একটা আলুগুলো সাবাড় করছে আর আস্তে আস্তে টেনিদার পিঠ চুলকে দিচ্ছে। আরামে হাঁ করে ঘুমুচ্ছে টেনিদা, থেকে থেকে বলছে, দে ক্যাবলা, আর একটু ভালো করে চুলকে দে!

এবার আমরা তিনজনেই গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম! টেনিদা—বাঁদর—বাঁদর!

—কী! আমি বাঁদর!—বলেই টেনিদা হাঁ করে সোজা হয়ে বসল—সঙ্গে সঙ্গেই বাপ বাপ বলে চিৎকার!

—ইঁ-ইঁ—ক্লিচ-ক্লিচ! কিচ-কিচ!

চোখের পলকে বানরগুলো কাঁঠাল গাছের মাথায়। চাল-ডাল-আলুর পুঁটলিও সেইসঙ্গে। আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে তরিবত করে খেতে লাগল—সেইসঙ্গে কী বিচ্ছিরি ভেংচি! ওই ভেংচি দেখেই না লঙ্কার রাক্ষসগুলো ভয় পেয়ে যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল।

পুকুরের ঘাটলায় চারজনে আমরা পাশাপাশি চুপ করে বসে রইলাম। যেন শোকসভা।

খানিক পরে ক্যাবলাই স্তব্ধতা ভাঙল।

— বনভোজনের চারটে বাজল।

— তা বাজল।—টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : কিন্তু কী করা যায় বলতো প্যালা? সেই লেডিকেনিগুলো কখন হজম হয়ে গেছে—পেট চুঁই-চুঁই করছে খিদেয়।

অগত্যা আমি বললাম বাগানে একটি গাছে জলপাই পেকেছে, টেনিদা—

—জলপাই! ইউরেকা! বনে ফলভোজন— সেইটেই তো আসল বনভোজন। চল চল, শিগগির চল!

লাফিয়ে উঠে টেনিদা বাগানের দিকে ছুটল।

হাতে কলমে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৭—১৯৭০) : জন্ম দিনাজপুরে। দিনাজপুর, ফরিদপুর, বরিশাল এবং কলকাতায় শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্পকার ও ঔপন্যাসিক। তাঁর রচিত বিখ্যাত গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে—*বীতংস, দুঃশাসন, ভোগবতী* প্রভৃতি। *উপনিবেশ, বৈজ্ঞানিক, শিলালিপি, লালমাটি, সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, পদসঞ্চার* তাঁর রচিত জনপ্রিয় উপন্যাস। শিশু ও কিশোরদের জন্য তাঁর অন্যতম স্মরণীয় সৃষ্টি টেনিদা চরিত্র।

১.১ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের কোন বিখ্যাত চরিত্রের সৃষ্টিকর্তা?

১.২ তাঁর লেখা দুটি উপন্যাসের নাম লেখো।

২. নীচের প্রশ্নগুলির কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :

২.১ বনভোজনের উদ্যোগ কাদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল?

২.২ বনভোজনের জায়গা কোথায় ঠিক হয়েছিল?

২.৩ বনভোজনের জায়গায় কীভাবে যাওয়া যাবে?

২.৪ রাজহাঁসের ডিম আনার দায়িত্ব কে নিয়েছিল?

২.৫ বনভোজনের বেশিরভাগ সামগ্রী কারা সাবাড় করেছিল?

২.৬ কোন খাবারের কারণে বনভোজন ফলভোজনে পরিণত হলো?

শব্দার্থ : গেরো — গ্রন্থি, এখানে দুর্ভাগ্য অর্থে ব্যবহৃত। খলিফা — ওস্তাদ। দ্রাক্ষাফল — আঙুর ফল। খাট্টা — টক।

৩. নীচের শব্দগুলির সন্ধিবিচ্ছেদ করো :

মোগলাই, রান্না, বৃষ্টি, পরীক্ষা, আবিষ্কার

৪. নীচের শব্দগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার করো :

বিচ্ছিরি, প্ল্যান-ট্যান, লিস্টি, ভদ্দর, ইস্টুপিড

৫. নীচের বাক্যগুলি প্রত্যেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে নিয়ে লেখো :

৫.১ আর সে গাট্টা, ঠাট্টার জিনিস নয়— জুতসই লাগলে স্রেফ গালপাট্টা উড়ে যাবে।

৫.২ দ্রাক্ষাফল অতিশয় খাট্টা।

৫.৩ আহা— হা চৈইত্যা যাইত্যাছ কেন?

৫.৪ এক চড়ে গালের বোম্বা উড়িয়ে দেব।

৬. **ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো :**

বনভোজন, দলপতি, বেরসিক, দ্রাক্ষাফল, রেলগাড়ি

৭. **নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো :**

৭.১ লাফিয়ে উঠে টেনিদা বাগানের দিকে ছুটল। (জটিল বাক্যে)

৭.২ চোখের পলকে বানরগুলো গাছের মাথায়। (জটিল বাক্যে)

৭.৩ দুপুরবেলায় আসিস। বাবা-মেজদা অফিসে যাওয়ার পরে। (একটি সরল বাক্যে)

৭.৪ ইচ্ছে হয় নিজে বের করে নাও। (জটিল বাক্যে)

৭.৫ টেনিদা আর বলতে দিলে না। গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল। (একটি সরল বাক্যে)

৮. **নীচের শব্দগুলির সমার্থক প্রবচনগুলি খুঁজে বের করো এবং তা দিয়ে বাক্যরচনা করো:**

চুরি, নষ্ট হওয়া, পালানো, গোলমাল করে ফেলা, লোভ দেওয়া, চুপ থাকা

৯. **টীকা লেখো :**

কলম্বাস, লেডিকেনি, বিরিয়ানি, ইউরেকা

১০. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ উত্তর দাও :**

১০.১ বনভোজনের প্রথম তালিকায় কী কী খাদ্যের উল্লেখ ছিল? তা বাতিল হলো কেন?

১০.২ বনভোজনের দ্বিতীয় তালিকায় কী কী খাদ্যের উল্লেখ ছিল এবং কে কী কাজের দায়িত্ব নিয়েছিল?

১০.৩ প্যালার রাজহাঁসের ডিম আনার ঘটনাটির বর্ণনা দাও।

১০.৪ ট্রেন থেকে নেমে হাঁটতে গিয়ে তাদের কী কী বিপদ ঘটেছিল?

১০.৫ 'মাছের কালিয়ার তিনটি বেজে গেল'— মাছের কালিয়া সম্পর্কে এ রকম বলার কারণ কী?

১১. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

১১.১ এই গল্পটির নাম 'বনভোজন' না হয়ে 'বনভোজনের ব্যাপার' হলো কেন?

১১.২ এই গল্পে ক'টি চরিত্রের সঙ্গে তোমার দেখা হলো? প্রত্যেকটি চরিত্র নিয়ে আলোচনা করো।

১১.৩ এ গল্পটিতে হাস্যরস সৃষ্টির জন্য ভাষার দিক থেকে লেখক নানারকম কৌশল অবলম্বন করেছেন। কী কী কৌশল তুমি খেয়াল করেছ লেখো।

১১.৪ শীতকালে পিকনিক নিয়ে তোমার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি লেখো/ গল্প লেখো।

১১.৫ টেনিদা-র মতো আরো কয়েকটি 'দাদা'চরিত্র বাংলা সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়। এরকম তিনটি চরিত্র নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

নিখিল-বঙ্গ-কবিতা-সংঘ

নলিনী দাশ

বড়ো মিস বিশ্বাসের ক্লাস, বিষয়বস্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ, তাতে আবার আকাশ অন্ধকার করে মেঘ ঘনিয়েছে। প্রাণপণে হাই চেপে ছুটির ঘণ্টার প্রতীক্ষায় আছি। এমন সময় ডেস্কের তলা দিয়ে একখানা দলা পাকানো কাগজ এসে আমার হাতে ঠেকল,— এমন চমকে গিয়েছিলাম যে আর একটু হলেই শব্দ করে ফেলতাম আর বকুনি খেতাম। পর-মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম এ আমাদের 'গন্ডালু' দলের কোনো 'লু'-এর কাজ! ও বাবা, মিস বিশ্বাস যে আমার দিকেই তাকাচ্ছেন! তাড়াতাড়ি ভালো মানুষের মতো মুখ করে পড়ায় মন দিলাম। ভয় আর কৌতূহলের মধ্যে দ্বন্দ্বের শেষে কৌতূহলেরই জয় হলো, সাবধানে কোঁচকানো কাগজটা কোলের ওপর মেলে ধরলাম। ওমা! এ যে দেখি পদ্য— মালুর কীর্তি নিশ্চয়!

স্কুলে ভরতি হবার দিন কয়েক বাদেই মালু তার মাসির বাড়ি গিয়েছিল আর সেখান থেকেই কালুকে পদ্যে চিঠি লিখেছিল:

কালু ভাই, পেয়ে তোর পত্তোর
ভাবলাম 'দিতে হবে উত্তর'—

পেন নিয়ে বসে গেছি সত্বর,
চুল বেঁধে, করে সাজসজ্জা।।
হয় যদি কবিতাটা মন্দ
মিল ভাঙে, কেটে যায় ছন্দ,
তবু তোর হবে তো পছন্দ?
না হলেও নেই মোর লজ্জা।।

সেই থেকেই মালুর কবি-খ্যাতি সারা স্কুলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের ক্লাসে উনিশটি মেয়ে ছিল বলে মালু সকলের নাম দিয়ে লম্বা একটি পদ্য লিখেছিল—
'ঊনবিংশতি-রত্ন-কথা।'

'বিক্রমাদিত্যের সভাগৃহখানি
নটি রত্নের গুণে ভরেছিল জানি।
সংখ্যাটা আজি যদি বাড়ে, কিবা ক্ষতি?
রত্ন তো নটি নয়, ঊনবিংশতি
কলিকালে রাজসভা কোথা থেকে পাবে বলো?
ছোটো ক্লাসরুম তারা করে থাকে আলো।

প্রত্যেকটি মেয়ের নামে কয়েক ছত্র কবিতা লিখবার পরে নিজের বেলায় ফাঁকি দিয়েছিল—

'নিজ মুখে নিজ গুণ বলা নাহি যায়,
শরমেতে কালি মোর কলমে শুকায়!'

তারপর থেকে স্থানে অস্থানে, সময়ে অসময়ে, কাটা কুলগাছের শোকসভায় কী পরীক্ষার্থিনীদের সংবর্ধনায়, চাইতে না চাইতেই মালুর পদ্য প্রস্তুত!

মিস বিশ্বাসের চোখ এড়িয়ে কাগজটা ভালো করে দেখলাম— এ কী ব্যাপার আজ? এ তো কেবল মালুর লেখা নয়— বাদলা হাওয়ায় সকলের মনেই কবিত্ব জেগেছে দেখি আজ!

প্রথমেই অবশ্য মালুর লেখা :

'হে বোনেরা মোর
ঝরে আঁখি লোর,
কিবা গাব আজ কহ—
পচা পচা ক্লাস
করে বারো মাস
জীবন দুর্বিষহ!
তার চে অদ্য,
লিখিয়া পদ্য,
সারা পিরিয়ড ধরি,

নিখিল বঙ্গ
কবিতা সংঘ
আমরা স্থাপন করি।'

সমস্ত কাগজখানা জুড়ে নানা রকম ছড়া। বড়ো বড়ো হরফে লেখা :—

'আমরা দুজন আছি দলে
কাজল এবং বীণা বলে।'

তার পরে লাল পেনসিলে লেখা—

'মোরা তোমাদের সংঘ
যোগ দেবো আজি রঙ্গে
লেখা যদি হলো মন্দ
করবিনে তো ভাই দ্বন্দ্ব?'

তারপর প্রায় ডজনখানেক সই — ক্লাসের কোনো মেয়েই বাদ পড়েনি দেখছি! এককোণে বুলু ছোটো ছোটো করে লিখেছে—

'আমি তো নিশ্চয় আছি
সংঘ শুরু হলে বাঁচি!'

অন্য কোণে কার লেখা? নাম দেওয়া নেই, কিন্তু এ কালু না হয়ে যাবে না :

'আমি তো ভাই,
মিলটিল রেখে পদ্য লিখতে চাই—
কিন্তু ছন্দ-টন্দ কিছু ঠিক থাকে না যে ছাই!
তা বলে দল থেকে আমাকে একেবারে বাদ দিয়ে দিবি কি তাই?'

আরেকটু হলেই হেসে ফেলেছিলাম। ও বাবা, মিস বিশ্বাস যে আমার দিকে ঘনঘন তাকাচ্ছেন। নিশ্চয় সন্দেহ করছেন— প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন নাকি? কী হবে, কিছুই তো শুনছিলাম না এতক্ষণ! বাঁচিয়ে দিল কালু। হাত তুলে সে নিজেই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। মিস বিশ্বাস তার দিকে তাকাতেই আমি চুপি চুপি লিখে ফেললাম—

'ক্লাসের মাঝারে কবিতা রচনা
সুবিধা কি ভাই?
কোনদিন শেষে ধরা পড়ে যাব,
বকুনি খাব যে তবে!'

সন্তর্পণে লেখা কাগজটা আবার মালুর হাতেই ফেরত দিলাম। ঠিক তখনই ক্লাস শেষ হবার ঘণ্টা পড়ে গেল ঢং ঢং করে।

এইভাবে ক্লাসের মধ্যেই আমাদের নিখিল বঙ্গ কবিতা সংঘে জন্ম হয়েছিল।

কাজ শুরু করতে গিয়ে কিন্তু দেখা গেল মহা মুশকিল! অধিবেশন করার উপযুক্ত সময় পাওয়াই দায়!

গন্ডালু-দলের— মানে আমরা চার বন্ধু মালু, কালু, বুলু আর আমি (টুলু)— উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। কালুকে সভাপতি, বুলুকে তার সহকারী আর আমাকে কোশাধ্যক্ষ করে মালু নিজে হলো সংঘ সম্পাদিকা। গালভরা নাম সব! কিন্তু সভা কই যে তার আবার সভাপতি? বাইরে থেকে যে মেয়েরা আসে তারা তো ক্লাস শেষ হতে না হতেই বাড়ি চলে যায়। টিফিনের মাত্র আধ ঘণ্টা ছুটি, তখন টিফিন খাব, না কাব্যি করব? অবশেষে, বাইরের মেয়েরা ছেড়ে দিলো, কেবল বোর্ডাররাই মেম্বার হলো। 'কোশে' দু-দশ টাকা জমাও পড়ল। কিন্তু, সভা করব কখন?

মালু বলল, 'সাহিত্যচর্চা তো আর দশ পনেরো মিনিটে হুড়মুড়িয়ে সারা যায় না— অন্তত ঘণ্টা দুই বসতে হবে সকলকে।'

বুলু বলল, 'তবেই হয়েছে! সকালে পড়া, বিকেলে খেলা, সন্ধ্যায় আবার পড়া তারপরে খাওয়া আর ঘুম। দু-ঘণ্টা সময় একসঙ্গে ফাঁক পাবে কখন শুনি?'

আমি বলতে গিয়েছিলাম রবিবার দুপুরে— কিন্তু কথাটা শেষ না হতেই কাজল, ললিতা আর বিজলি আপত্তি করল 'বারে, রবিবার তো বাড়ি যাই আমরা—'

মালু বলল, 'তাহলে শনিবার বিকেলে—'

এবার আপত্তি তুলল বীণা, হাসি আর নন্দিতা, 'আমাদের যে গানের ক্লাস থাকে শনিবার বিকেলে!'

কালু রেগে বলল 'তবে ক্ষ্যান্ত দে ক্ষ্যান্ত দে! নাচ শিখবি, গান শিখবি, বাড়ি যাবি আবার কাব্যিও করবি— অত শত পারা যাবে না!'

কাজল আর বীণাও চটে গেল, 'তবে অমন সভা চাই না, আমাদের নাম কেটে দে!'

তাড়াতাড়ি মিটমাট করবার চেষ্টা করল মালু। 'মাথা গরম করিস্ না—থাম্—ভেবেচিন্তে সকলের সুবিধামতন সময় ঠিক করো।'

'ভেবে ভেবে তো হদ্দ হলাম'—বিরসবদনে গাল ফুলিয়ে উত্তর দিল বুলু।

পশ্চিমের ডর্মিটরিতে সন্ধেবেলা বসে কথা হচ্ছিল। কদিন ধরে সমানে বৃষ্টি চলছে। মাঠে-ঘাটে-রাস্তায় প্যাচপ্যাচে কাদা, কদিন ধরে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ, খেলা বন্ধ, রোজ রোজ কেবল হল ঘরে ড্রিল হয়। সবাই অস্থির হয়ে উঠেছি—মন মেজাজ খারাপ—'কি করি-কি করি' ভাব সকলের —'একটা নতুন কিছু চাই!, একটা মজার কিছু চাই!'

'ইউরেকা!' চেঁচিয়ে উঠল কালু, 'আমাদের নিখিল বঙ্গ কবিতা সংঘের প্রথম অধিবেশন হোক রাত বারোটায়!'

'ও বাবা!' — 'রাত বারোটা?' —'কোথায়?' — 'কবে?' — 'কী করে হবে?' —তাকে সবাই আমরা প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে তুললাম।

'ঝড়-বাদলের দিনে তো আর বাইরে করা যাবে না,—আমার মনে হলো খাবার ঘরেই সবচেয়ে ভালো হবে।'

'ধরা পড়ব না তো?'

'অত রাতে তো আর ওখানে কেউ থাকবে না। খুব সাবধানে পা-টিপেটিপে যেতে হবে— যেন কাক -পক্ষীটিও টের না পায়!'

'যা ষাঁড়ের মতন চেঁচাচ্ছিস—দুনিয়ার লোক তো এখনই সব জেনে গেল। দরজার বাইরে কে?'

'এই চুপ, চুপ—আস্তে কথা বল্—' সবাই উত্তেজনা সামলে নিল। বীণা তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'ও কেউ না, কেষ্টদাসী মণিকাদিদের ঘর ঝাঁট দিতে এসেছে—'

এরপরে আমাদের ফিশফিশ করে পরিকল্পনা হলো। কদিন ধরে সব কিছু কেমন যেন নীরস মনে হচ্ছিল। কিন্তু সাহিত্য-সভার ব্যবস্থা হতেই যেন মন্ত্রবলে সকলের মন মেজাজ ভালো হয়ে গেল । একটা সাংঘাতিক গোপন উত্তেজনা, পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেই চোখ-টেপা আর চাপা হাসি। ক্লাসের পড়ায় অবশ্য সকলেই কেবল ভুল করতে লাগলাম আর বকুনিও খেলাম। কিন্তু কার সাধ্য যে আমাদের দমিয়ে দেয়।

বুলু দুই ক্লাসের ফাঁকে ফিশফিশ করে বলল, 'আমার কিন্তু ভাই বড্ড ভয় করছে! মণিকাদির যেন কেমন রাগ-রাগ ভাব! তবে কী —'

নিজের মনের ভয় চেপে রেখে তাকে সাহস দিলাম, 'ভাগ, ভীতু কোথাকার! পড়া না পারলে তো রাগ করবেনই। দেখিস, এর পরের দিন ভালো করে পড়া শিখে এসে কত খুশি করে দেবো।'

কালুর সব কাজই নিখুঁত। দুই ক্লাসের মধ্যে মধ্যে আমাদের কাছে ছোটো ছোটো একেকটা চিরকুট পাঠাতে লাগল — 'সম্পাদিকার রিপোর্ট তৈরি আছে তো মালু?' — 'বিস্কুট আনবার ভার তোর, মনে আছে হাসি?' — 'পেয়ারা, বিস্কুট আর চিনেবাদাম কিনবার পয়সা বুলু, হাসি আর কাজলকে দিয়ে দিস টুলু।'

নিদারুণ উত্তেজনার দিন যেন আর কাটতে চায় না! দুপুর আর বিকেল হয় না, বিকালের পর সন্ধে হবার নাম নেই, তারপর রাত কিছুতেই হতে চায় না!

শেষে রাত যদিও হলো, শোবার ঘণ্টাও পড়ল, 'কিছুতেই ঘুমোব না' পণ করে শুয়ে কখন যেন ঘুমিয়েও পড়লাম।

মাঝ রাতে কালুর সাংকেতিক শিস শুনে ঘুম ভেঙে গেল— থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম প্রথমে— কী হবে?— কী যেন হবে?— ঠিক ঠিক, আমাদের কবিতা সংঘে প্রথম অধিবেশন হবে। মনে পড়তেই চট করে পুরোপুরি সজাগ হয়ে গেলাম। বুলুটাও অঘোরে ঘুমচ্ছে,— একধাক্কায় ওকে জাগিয়ে দিলাম। কোনোমতে জামাটা গায়ে দিলাম, চিরুনি খুঁজে পাচ্ছি না— যাকগে— মাঝরাতে কে আর আমাদের চুলের অবস্থা লক্ষ করতে যাচ্ছে! চুল না আঁচরেই তৈরি হয়ে নিলাম।

ততক্ষণে মালু আর কালু গিয়ে পূর্ব দিকে ডর্মিটরির মেয়েদেরও ডেকে নিয়ে এসেছে। খালি পায়ে অতি সাবধানে আমরা নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে চললাম। 'কিচ'— সিঁড়ির দরজা সামান্য শব্দ করতেই কালুর চাপা ধমক— 'আস্তে!' কানে কানে বুলু বলল, 'ও বাবা— ভয় করেছ!'

মাঝরাতে সব কিছুই অস্বাভাবিক লাগছে। তাদের যেন নিশ্বাসের ফোঁশফাঁশ, নড়াচড়ার খুসখাস আর কথা বলার ফিশফাশ! দূর— সব নিশ্চয় আমাদের কল্পনা— মাঝরাতে আর কে কোথায় থাকবে? চারদিকে নিস্তব্ধ, নিঝুম। কেবল দূরে একবার শেয়াল ডাকল।

মাঝরাতে ট্রেনটা চলে গেল। সকলের সামনে ছিল কালু। সাবধানে খাওয়ার ঘরের দরজা খুলে সে ভিতরে ঢুকল— পিছন পিছন হুড়মুড়িয়ে ঢুকলাম আমরা সকলে— আর ঢুকেই হকচকিয়ে থমকে দাঁড়ালাম!

সেদিনের হতভম্ব ভাব কি জীবনে কোনোদিন ভুলব? এ কি সত্যি না স্বপ্ন? ঘটনা না কল্পনা? মস্ত বড়ো খাবার ঘরখানা আলোয় আলোয় ঝলমল করছিল— ঠিক স্কুলের বার্ষিক উৎসবের সময় যেমন সাজানো হয়। মাঝের বড়ো টেবিলে শৌখিন সাদা ফুলকাটা চাদর পাতা ছিল। বড়ো বড়ো পিতলের ফুলদানিতে পদ্ম আর গোলাপ সাজানো ছিল। ভালো ভালো কাঁচের বাসনে অনেক খাবার সাজানো ছিল— আইসিং দেওয়া মস্ত বড়ো কেক, নানারকম সন্দেশ, আরো কী সব মিষ্টি, বড়ো বড়ো আপেল, মর্তমান কলা। টেবিলের চারদিকে চেয়ার সাজানো ছিল, তারই একদিকে তাঁরা বসেছিলেন সবাই।

ভালো করে চোখ রগড়ে আমরা আবার তাকিয়ে দেখলাম—হ্যাঁ তাঁরাই তো— মণিকাদি, অণিমাদি, হিরণদি, এমন কি মিস বিশ্বাস পর্যন্ত। তাঁদের পরনে দামি দামি সিল্কের জামাকাপড়—যেন নেমন্তন্ন বাড়িতে বা বড়ো কোনো উৎসবে এসেছেন। তাঁরা মুচকি মুচকি হাসছেন আর আমাদের স্তম্ভিত অবস্থাটা বেশ উপভোগ করছেন!

অণিমাদি ডেকে বললেন, 'এসো—এসো—দাঁড়িয়ে

আছ কেন?' আমরা তো এক পাও নড়তে পারছি না।

ঘড়ি দেখে নিয়ে মণিকাদি কালুকে বললেন, 'সভার কাজ শুরু করে দাও সভানেত্রী।'

ও বাবা, ওঁরা দেখি সব খবরই রাখেন!

এর পরে আর দেরি করা চলে না, কোনোমতে বসে পড়লাম। বুলু ফিশফিশ করে বলল, 'আমার হাতে যে পেয়ারার থলি, কী হবে!'

আমি ততক্ষণে চিনেবাদামের ঠোঙা মাটিতে ফেলে দিয়েছি।

অণিমাদি আবার বললেন, 'মেয়েরা, খেতে শুরু করো।'

মণিকাদি বললেন 'সভা আরম্ভ হোক।'

এত ভালো ভালো খাবার, তাও যেন আমাদের গলা দিয়ে নামতে চায় না। আর এমন সপ্রতিভ ডানপিটে মেয়ে কালু, সেও অপ্রস্তুতভাবে কাঁপা-গলায় শুরু করল— 'ভদ্রমহিলা আর মহোদয়গণ!'

কে যেন ফিশফিশ করে বলল, 'মহোদয় কেরে?' দু-এক জনের চাপা-হাসি শোনা গেল। মণিকাদি প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের সব কাজ কি কবিতায় হবে?'

কালু আবার শুরু করল,

'ভদ্রমহিলা আর মহোদয়গণ,
আসিনি করিতে আমি মিঠে আলাপন।
অকবি কাজের কথা বলে নেব আগে,
কবির কবিতা যাতে বেশি মিঠে লাগে।
আজিকার আলোচনা পরীক্ষার বিষয়,
কবিরা এবার বলো যাহা মনে লয়।'

মণিকাদির হাততালির সঙ্গে আমরাও সকলে যোগ দিলাম।

হঠাৎ বুলুর হাতের পেয়ারার থলি কেটে গিয়ে ডজন খানেক ডাঁসা আর কাঁচা পেয়ারা মাটিতে ধপাধপ পড়ে চারিদিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে, কিন্তু আমরা কিছুই শুনিনি-কিছুই জানি না মুখ করে রয়েছি।
তারপর কাজলের পালা—

'দিদিমণি শোনো, ছাত্রীর আবদার শোনো,
পরীক্ষা পাশ করি যেন, আর মোর সাধ নেই কোনো।
আমরা চেঁচাব যত খুশি
ক্লাসে যদি না যাই, না যাব,
হেসে দেবো অকারণে হাসি,
কোনোদিন বই নাহি ছোঁব।
তবু যদি পরীক্ষা হয়,
পাশ করে দিও নিশ্চয়।'

আবার চটাপট হাততালির পালা। ততক্ষণে মেয়েদের উৎসাহ আর সাহস বেড়েছে। দুরু দুরু বক্ষে আমি শুরু করলাম এবার—

‘পরীক্ষা যদি কিছু না থাকিত আর,
সবগুলো বার যদি হতো রবিবার,
গল্পের বই যদি সব বই হতো,
হতেন খেলার সাথি শিক্ষিকা যত,
স্কুল বা কলেজ কিছু না থাকিত দেশে
তাহলে কী মজা হতো, ভাবি বসে বসে!’

বীণার কবিতার—দু-লাইন কেবল মনে আছে—

‘দয়া করে তুমি হে!
আমাকে পাশ করিও,
ভুল করে যদি ভুল লিখে ফেলি
নম্বর তবু দিও।’

বুলু কবির ওপর কেরদানি করে প্যারডি লিখেছিল—

‘রেখো গো আমারে মনে, এ মিনতি করি পদে।
পরীক্ষা করিতে পাশ
গলে যদি লাগে ফাঁস
ভুলিয়া যেও না মোরে স্ফীত হয়ে গর্বপদে!’...

সভার কাজ চলতে লাগল। প্রথমে ভয়ে ভয়ে শুরু করলেও, দিদিদের উৎসাহে সাহস পেয়ে একে একে সব কটি মেয়ে কবিতা পড়ে ফেলল। কবিতা পড়তে পড়তে কখন যে অতগুলো ভালো ভালো খাবার খেয়ে শেষ করে ফেললাম, নিজেরাই বুঝতে পারলাম না—মাঝরাতে যে অত খিদে পেতে পারে কে জানত!

প্রত্যেকটি মেয়ের নামে দু-দু-লাইন কবিতা সহ সম্পাদিকার রিপোর্ট দিয়ে শেষ হলো :

‘নিখিল-বঙ্গ-কবিতা-সংঘ নতুনই হয়েছে সৃষ্টি।
এর মধ্যেই করেছে সবার আকর্ষণ সে দৃষ্টি!
খুবই ভালো লোক যিনি প্রেসিডেন্ট, কাকলি চক্রবর্তী
মুখটি যেমন সদা হাসিমাখা, মনটিও স্নেহে ভরতি
সহকারী তাঁর বুলুবুলী সেন, বলব কি বেশি আর,
রূপে, গুণে, কাজে কোনো ত্রুটি নাই, মানুষ চমৎকার
ট্রেজারার যিনি লোক বড়ো ভালো, নাম তাঁর টুলু বোস।
রূপেও যেমন, কাজেও তেমন, নাই তাঁর কোনো দোষ।
মন্দ নেহাত নন সেক্রেটারি মালবি মজুমদার
(নিজমুখে নিজ গুণগান করা শোভা পায় না তাঁর)

মেম্বার যাঁরা আছেন তাঁদের একে একে দিই লিস্টি
মোটের ওপর সকলেই তাঁরা লোক অতিশয় মিষ্টি।'

সভানেত্রীর অনুমতি নিয়ে অণিমাদি উঠে দাঁড়িয়ে টিচারদের পক্ষ থেকে কবিতা সংঘকে অভিনন্দন জানালেন। এবার উঠে দাঁড়ালেন মণিকাদি—ও বাবা, বকবেন নাকি? আমরা ভয়ে ভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম।

মণিকাদি শুধু বললেন—'আজকের সভা এখানেই শেষ হোক—যাও, এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতন সবাই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো দেখি।'

আর কি আমরা দাঁড়াই সেখানে?

এরপর কয়েকদিন আমাদের কী যে ভয়ে ভয়ে কাটল কী বলব! কীভাবে আমাদের গোপন সভার কথা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল সেটা আজ পর্যন্ত জানি না। হয়তো কেষ্টদাসী আড়ি পেতে শুনে দিদিদের বলে দিয়েছিল; কিংবা হয়তো অণিমাদি পাশের বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে আমাদের কথা শুনে ফেলেছিলেন—প্রথমে আমরা যা চেঁচাচ্ছিলাম!

আমাদের বিস্কুট-পেয়ারা চিনেবাদামের কী গতি হয়েছিল তাও জানতে পারিনি। আমরা তো সেগুলি খাবার ঘরের মেঝেতেই ফেলে রেখে চলে এসেছিলাম। আমাদের কি আর সে সব ভাববার অবসর ছিল? কখন টিচারদের ঘরে ডাক পড়বে, কত না জানি বকুনি খেতে হবে,—তার জন্যই আমরা দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা করছিলাম। কী না জানি শাস্তি পাব সেই ভয়তেই আমরা তখন অস্থির!

টিচারদের ঘরে ডাক অবশ্য পড়ল। কিন্তু কী আশ্চর্য! শাস্তি দূরে থাক, বকুনিও খেলাম না। মাঝরাতের সভার নাম পর্যন্ত কেউ উচ্চারণ করলেন না। কেবল আলোচনা হলো সাহিত্য সভার উপযুক্ত সময় কীভাবে পাওয়া যেতে পারে।

ঠিক হলো যে এর পরের সপ্তাহ থেকেই সোম-মঙ্গল-বুধ এবং বৃহস্পতিবারে সকাল-সন্ধ্যা পড়ার ঘন্টা পনেরো মিনিট করে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আর তার পরিবর্তে শুক্রবার সন্ধেবেলা পড়ার ঘণ্টা থাকবে না, তখন মেয়েদের সাহিত্যসভা, গানের আসর বা অভিনয়-জাতীয় কোনো কিছু হবে।

আবার অণিমাদি আমাদের লেখাগুলির প্রশংসা করলেন, আমরা যেন লেখার অভ্যাস না ছাড়ি একথা বারবার বললেন।

মণিকাদি মন্তব্য করলেন, 'অবশ্য, সব সময়েই পরীক্ষা-বিরোধী কবিতা লিখো না।'

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে ফিশফিশ করে কালু বলল, 'আমাদের দিদিদের মতন ভালো টিচার কি কোনো স্কুলে আছেন?'

উৎসাহ উজ্জ্বল মুখে মালু বলল, 'তাঁদের মুখ রাখতে হবে। সাহিত্য সভাকে ভালো করে গড়ে তুলতে হবে।'

সত্যিই আজকাল আমাদের সাহিত্য সংঘ যা জমজমাট হয়েছে কি বলব। সপ্তাহে সপ্তাহে অধিবেশন হয়, একটা হাতে লেখা পত্রিকাও বেরিয়েছে। ক্লাসের সব মেয়েরা যোগ দিয়েছে। সকলেরই লেখার আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে—তবে, বিশেষ করে গণ্ডালু দলের!

সবুজ জামা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গাছেরা কেমন সবুজ জামা পরে থাকে
আমাদের তোতাইবাবুরও একটি সবুজ জামা চাই।

চাই তো— কিন্তু তুই এখন অ-আ-ক-খ শিখবি।
ইস্কুলে যাবি।

গাছেরা এক-পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে
তাদের জামা তুই গায়ে দিতে চাস কেন?

তোতাই অ-আ-ক-খ পড়বে না
ইস্কুলে যাবে না;
আর, এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা তো খেলা—
দাদু যেন কেমন, চশমা ছাড়া চোখে দেখে না।

তোতাইয়ের একটি সবুজ জামা চাই
তবেই না তার ডালে প্রজাপতি বসবে
আর টুপ করে তার কোলের ওপর নেমে আসবে
একটা, দুটো, তিনটে লাল-নীল ফুল

তার নিজের...

হাতে কলমে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০—১৯৮৫) : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি। তাঁর রচিত অজস্র কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতি, চারপাশের মানুষজন, নানান জীবন সংগ্রাম ও পরিস্থিতি রূপায়িত হয়েছে। *গ্রহচ্যুত, রাণুর জন্য, লখিন্দর, ভিসা অফিসের সামনে, মহাদেবের দুয়ার, মানুষের মুখ, ভিয়েতনাম : ভারতবর্ষ, আমার যজ্ঞের ঘোড়া : জানুয়ারি* ইত্যাদি তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থ। তিনি বহু কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ করেছেন।

১.১ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

১.২ তাঁর রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ তোতাইবাবুর সবুজ জামা চাই কেন?

২.২ সবুজ গাছেরা কোন পতঙ্গ পছন্দ করে?

২.৩ সবুজ জামা আসলে কী?

২.৪ ‘এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা তো খেলা’— এখানে কোন খেলার কথা বলা হয়েছে?

২.৫ তোতাই সবুজ জামা পরলে কী কী ঘটনা ঘটবে?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৩.১. ‘দাদু যেন কেমন, চশমা ছাড়া চোখে দেখে না।’— এই পঙ্‌ক্তির মধ্যে ‘যেন’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কেন? এই রকম আর কী কী শব্দ দিয়ে একই কাজ করা যায়?

৩.২. ‘সবুজ জামা’ কবিতায় তোতাইয়ের সবুজ জামা চাওয়ার মাধ্যমে কবি কী বলতে চাইছেন তা নিজের ভাষায় লেখো।

৪. **নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও :**

৪.১. ‘ইস্কুল’ শব্দটির ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা লেখো এবং একই রকম আরো দুটি শব্দ লেখো।

৪.২. ‘চোখ’ শব্দটিকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে অন্তত তিনটি বাক্য লেখো।

চিঠি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১২ রু-দ্য শ্যাঁতিয়ারস, ভার্সাই, ফ্রান্স
৩ নভেম্বর ১৮৬৪

প্রিয় বন্ধু,

আমার আগের একটি চিঠিতে আমি আপনাকে পরিষ্কার করেই হয়তো জানাতে পেরেছি, আমি একাকী লন্ডনে কেন যেতে চাই — একা যাওয়ার কারণ যখন জানিয়েছি তখন, আমার বিশ্বাস, আপনি আমার হয়ে আমাদের বিষয় আসয় তত্ত্বাবধান করবেন, যে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জলরাশি থেকে আপনি আমাদের উদ্ধার করেছেন আবার গিয়ে সেই বিপদে না পড়ি আপনি তা দেখবেন...।

শীতকাল এল বলে, এবার মারাত্মক শীত পড়বে বলে মনে হচ্ছে। ইউরোপের শীতকাল সম্বন্ধে আপনি কোনো ধারণা করতে পারবেন না। এখনও শরৎকাল আছে, তবু আমার ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয়েছে; আর, গায়ে এমন জামাজোব্বা পরে আছি যা নাকি আমাদের দেশে ছোটোখাটো একটা মোট বিশেষ। আমাদের দেশের সবচেয়ে ঠান্ডার মাসের সবচেয়ে ঠান্ডার দিনের চেয়েও এখানে প্রায় ছয় গুণ বেশি ঠান্ডা! আপনার কি ভারতচন্দ্রের সেই লাইনটা মনে আছে?

বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী

তিনি যদি এদেশে থাকতেন শীত সম্বন্ধে কী লিখতেন?

হে প্রিয় বন্ধু, আপনি মনে করবেন না যে, আমি এখানে অলসভাবে দিন কাটাচ্ছি। আমি ফ্রেঞ্চ ইটালিয়ান প্রায় রপ্ত করে ফেলেছি, এখন মনোনিবেশ করে জার্মানি ভাষা চর্চা করছি — এবং এসব মাইনে করা কোনো শিক্ষকের সহায়তা ছাড়াই। জার্মান হচ্ছে অদ্ভুত ভাষা। আপনি জানেন, আমিও অকপটেই বলি এর বর্ণমালা রোমান নয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর নয়, পরে হবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার (পরে মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত) বীরসিংহ গ্রামে এঁর জন্ম। এঁর তুল্য পণ্ডিত ও সমাজসংস্কারক খুব কমই আছেন। দুইটি চতুর্দশপদী কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি মধুসূদন তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মধুসূদনের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরাগ এইটেই প্রমাণ করে যে, মধুসূদনের প্রতিভা ঈশ্বরচন্দ্র হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, তিনি স্বয়ং প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলেই আর-এক প্রতিভাকে এত কাছে থেকেও ধরতে পারেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লোকান্তরিত হন।

প্রিয় গৌর,

হে আমার প্রিয় ও পুরাতন বন্ধু, আমি 'সীলোন' নামক জাহাজে চলেছি, এখন তোমাকে কয়েক লাইন লিখবার জন্যে বসেছি। জাহাজটা হচ্ছে রূপকথার রাজ্যের ভাসমান একটি প্রাসাদ-বিশেষ, বুঝলে বৎস! এই জাহাজে সব ব্যাপারেই এমন অপূর্ব জাঁকজমকের ব্যবস্থা আছে বা নাকি তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। এর সেলুনগুলো এমন যা রাজপ্রাসাদেই মানায়, ক্যাবিনগুলো রাজকুমারদেরই উপযোগী। কিন্তু সেসব কথা ক্রমশ পরে বলা যাবে — আমি ইংলন্ডে পৌঁছোবার পর এই সমুদ্রযাত্রার বিস্তারিত বিবরণ দেবার জন্যে যখন সময় ও অবসর পাব, তখন। ঠিক এই সময়ে আমি ভেসে চলেছি বিখ্যাত সেই ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে, উত্তর-আফ্রিকার পর্বতাকীর্ণ উপকূল দেখা যাচ্ছে। গতকাল আমরা মলটায় ছিলাম, গত রবিবারে আলেকজান্দ্রিয়ায়। আর কয়েক দিনের মধ্যেই, আশা করছি, ইংলন্ডে পৌঁছে যাব। ঠিক ২২ দিন আগে আমি কলকাতায় ছিলাম! বেশ দ্রুতগতিতেই কি আমরা চলছি না? কিন্তু এই ভ্রমণের একটা বিষণ্ণ ব্যাপারও আছে। সব জানতে পারবে, ধৈর্য ধরো বন্ধু, ধারণ করো ধৈর্য। 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড'-এর জন্যে এই ভ্রমণের একটা সুদীর্ঘ ও বিস্তারিত বিবরণ লেখার ইচ্ছে আছে, এবং তার সম্পাদককে সেই পত্রিকার একটি কপি তোমাকে পাঠাতে বলারও বাসনা আছে, অবশ্য তুমি যদি তার গ্রাহক না-থেকে থাক। এখন কী নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছ, হে বন্ধু! আমার মনে হচ্ছে এই জাহাজে আমার দেশের আধা-ডজন খানেক লোক যদি থাকত, তাহলে নিজেদের নিয়েই একটা গোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারতাম। আমাদের হরি এখন কোথায় তা তোমার কি জানা আছে? যদি জান, তাহলে আমার কথা তাকে মনে করে দিয়ো। ইংলন্ডে গিয়ে আমি চিঠি না-দেওয়া পর্যন্ত এ চিঠির উত্তর দিয়ো না। সেখানে পৌঁছেই আমি তোমাকে আমার ঠিকানা জানাব; তখন তুমি তোমার প্রাণ উজাড় করে আমাকে অনবরত পত্রাঘাত করতে পারবে; যদিও আমার মনে হচ্ছে যে আমি তখন আমার বন্ধুদের জন্যে বেশি সময় খরচ করতে পারব না, কেননা, আমি জীবিকানির্বাহের জন্যে যে পেশা শিখতে এসেছি তাতে মনোনিবেশ করব বলে এবং সম্মান অর্জন করব বলে দৃঢ়সংকল্প।

স্পেনের উপকূল ছাড়িয়ে, রবিবার

এই দুই দিন চিঠিটা ফেলে রেখেছিলাম। কিন্তু আজ এটা শেষ করবই। আগামীকাল সকালে আমরা জিব্রলটারে পৌঁছোতে পারি, সেখানেই চিঠিটা ডাকে দেবো। তুমি ধারণা করতে পারবে না সমুদ্র আজ কতটা শান্ত; এটা, বিশ্বাস করো, আমাদের হুগলি নদীটির মতো। এখানকার আবহাওয়া আমাদের দেশের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ের মতো,ত খুব গরমও না, খুব ঠান্ডাও না। আমি ভেবেছিলাম খুবই বুঝি ঠান্ডা হবে জায়গাটা। কিন্তু সকলে বলছে, আমরা আটলান্টিকে ও বিস্‌কে উপসাগরে ঢুকলে সব অন্য প্রকার হবে। কোনো খবর? তোমাকে দেবার মতো এখন কিছু নেই, লন্ডনে পৌঁছে অনেক খবর দিয়ে তোমার আশ মেটাব। তুমি ঠিক জেনো, এমনকি আমার শিশুকাল থেকে আমি যে-দেশ সম্বন্ধে এমনভাবে চিন্তা করে এসেছি আমি প্রতিটি মিনিটে তার নিকটবর্তী হয়ে চলেছি, এ কথা যেন আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার হচ্ছে কল্পিত কাহিনি থেকেও বিচিত্র। এবার তাড়াতাড়ি শেষ করি, কিন্তু তার আগে জানিয়ে রাখি তোমার অকৃত্রিম ও আন্তরিক ও চির স্নেহমুগ্ধ —

গৌরদাস বসাক : মাইকেল মধুসূদনের বাল্যসুহৃদ। হিন্দু কলেজের সহাধ্যায়ী। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে বড়োবাজারের বিখ্যাত বসাক-পরিবারে গৌরদাসের জন্ম। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে এগারো বৎসর বয়সে তিনি হিন্দু-কলেজে ভর্তি হন। এর বছর তিন পরে, ১৮৪০ সনে, মধুসূদনের সংস্পর্শে তিনি আসেন, অচিরেই তা নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আনুমানিক ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে বৃত হন। অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গৌরদাসের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। সেকালের রঙ্গালয়-আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। মধুসূদনের প্রতি তাঁর এতই অনুরাগ ছিল, এবং মধুসূদনের প্রতিভা সম্বন্ধে এতটাই শ্রদ্ধা তাঁর ছিল যে, তিনি তাঁর এই বন্ধুটির জীবনী রচনার জন্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। মধুসূদনের মৃত্যুর প্রায় ২৭ বছর পরে ইনি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

প্রিয় রাজনারায়ণ,

ইতিমধ্যে তুমি তোমার পূরাতন ডেরায় পৌঁছে গিয়ে থাকবে। তোমাকে অনুনয় জানাচ্ছি, মেঘনাদ সম্বন্ধে আমাকে লেখো। তোমার রায় জানবার জন্য আমি রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করছি।

তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার কয়েক ঘণ্টা পরেই আমি প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ি, এবং ছয়-সাত দিন শয্যাগত থাকি। মেঘনাদ আমাকে শেষ করবে অথবা আমি মেঘনাদকে শেষ করব — সে সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়ার উপক্রম হয়েছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি জয়ী হয়েছি। মেঘনাদ মারা গিয়েছে, অর্থাৎ আমি ষষ্ঠ সর্গ শেষ করেছি প্রায় ৭৫০ লাইনে। তাকে মেরে ফেলতে আমাকে অনেক অশ্রুপাত করতে হয়েছে। যাই হোক, অল্পদিনের মধ্যেই তুমি এ সম্বন্ধে তোমার অভিমত খাড়া করার সুযোগ পাবে।

এই কাব্য অদ্ভুতরকম জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কেউ-কেউ বলছেন এটি মিলটনের চেয়ে উৎকৃষ্টতর — কিন্তু ওসব বাজে কথা — মিলটনের চেয়ে উৎকৃষ্টতর হতে পারে না কোনোকিছুই। অনেকে বলছেন এটি কালিদাসের কাছাকাছি, এ কথায় আমার কোনো আপত্তি নেই। ভার্জিল কালিদাস বা তাসো'র সমতুল্য হওয়া আমি অসম্ভব বলে মনে করি নে। তাঁরা যদিও কীর্তিমান, তবুও তাঁরা নশ্বর পৃথিবীর কবি; কিন্তু মিলটন স্বর্গীয়।

তোমার যা মনে হয়েছে তুমি তা লিখে জানাবেই। এ রকম হাজার-হাজার মানুষের জয়ধ্বনির চেয়ে তোমার অভিমত অনেক নির্ভরযোগ্য।

এ রকম শুনছি যে, অনেক হিন্দু মহিলা বইটি পড়ছেন, পড়ে ক্রন্দন করছেন। তোমার স্ত্রী যাতে কাব্যটি পড়েন তোমার সে ব্যবস্থা করা উচিত।

আমাকে চিঠি লিখো, এবং এক মুহূর্তের জন্যেও এ বিশ্বাস হারিয়ো না যে আমি অকপট ও আন্তরিকভাবে তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুরাগী।

পাঠ্য তিনটি চিঠির তরজমা করেছেন সুশীল রায়

রাজনারায়ণ বসু : ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার দক্ষিণে অবস্থিত বোড়াল গ্রামে জন্ম। শৈশবকাল থেকেই ইনি বিদ্যানুরাগী। ষোলো বছর বয়সে ইনি হিন্দু কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গৃহে মুনশির নিকট পারস্যভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। পরে, ১৮৫১ সালে মেদিনীপুর গবর্নমেন্ট স্কুলে হেডমাস্টার নিযুক্ত হন। ইনি মধুসূদনের একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ। উভয়ের প্রতি উভয়ের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, এবং এই ধর্ম প্রচারের জন্য অনেক উদ্যোগ করেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে দেওঘরে ইনি লোকান্তরিত হন।

হাতে কলমে

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩) : জন্ম অধুনা বাংলাদেশের যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে। বাল্যবয়সেই কলকাতায় এসে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক প্রমুখ। বিলেত যাওয়ার জন্য তিনি ধর্মান্তরিত হন। গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, ইংরেজি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করলেও বাংলা ভাষায় পরবর্তীকালে দক্ষতা লাভ করেন। *রত্নাবলী*, *শর্মিষ্ঠা*, *একেই কি বলে সভ্যতা*, *পদ্মাবতী* ইত্যাদি নাটক এবং *মেঘনাদবধ কাব্য*, *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য*, *চতুর্দশপদী কবিতা* ইত্যাদি তাঁর অসামান্য সৃষ্টি। *পদ্মাবতী* নাটকে তিনি প্রথম *অমিত্রাক্ষর ছন্দ* ব্যবহার করেন।

১.১ মধুসূদন দত্ত কোন কলেজের ছাত্র ছিলেন?

১.২ পদ্মাবতী নাটকে তিনি কোন ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন?

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

২.১ মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'প্রিয় ও পুরাতন বন্ধু' গৌরদাস বসাককে কোথা থেকে পাঠ্য চিঠিটি লিখেছিলেন? তাঁর যাত্রাপথের বিবরণ পত্রটিতে কীভাবে ধরা পড়েছে আলোচনা করো।

২.২ মধুসূদনের জীবনের উচ্চাশার স্বপ্ন কীভাবে পত্রটিতে প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে?

২.৩ বিদেশে পাড়ি জমানোর সময়েও তাঁর নিজের দেশের কথা কীভাবে পত্রলেখকের মনে এসেছে?

২.৪ '... একথা যেন আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।' — কোন কথা? সে-কথাকে বক্তার অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে কেন?

২.৫ প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে হৃদ্যতার ছবি পত্রটিতে কীভাবে ফুটে উঠেছে তা প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করো।

২.৬ রাজনারায়ণ বসুকে লেখা পত্রে লেখক তাঁর এই প্রিয় বন্ধুটির কাছে কোন আবেদন জানিয়েছেন?

২.৭ 'এই কাব্য অদ্ভুতরকম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।' — কোন কাব্যের কথা বলা হয়েছে? সে কাব্যের জনপ্রিয়তার কথা বলতে গিয়ে লেখক কোন কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন?

২.৮ প্রিয় বন্ধুর প্রতি, সর্বোপরি সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগের যে পরিচয় রাজনারায়ণ বসুকে লেখা পত্রটিতে পাওয়া যায়, তা বিশ্লেষণ করো।

২.৯ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ৩ নভেম্বর ১৮৬৪খ্রিস্টাব্দে লেখা মধুসূদনের চিঠিটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করো।

২.১০ বিদ্যাসাগরকে লেখা পত্রটিতে মধুসূদনের জীবনে তাঁর ভূমিকার যে আভাস মেলে, তা বিশদভাবে আলোচনা করো।

আলাপ

পূর্ণেন্দু পত্রী

বাইরে ঘোর কুয়াশা। ভিতরে উদ্বিগ্ন যাত্রীদের ভিড়। স্থান —পালাম বিমানবন্দর। তারিখ, ২১ ডিসেম্বর। সময় সকাল সাড়ে ছয়। একটু আগে মাইকে ঘোষণা করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত প্লেনগুলি ছাড়ছে না। কখন ছাড়বে, তা নির্ভর করছে সূর্যদেবের কিরণ অথবা করুণার উপর। সিকিউরিটির এলাকা ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকতেই চোখ আটকে গেল কফি কর্নারের গায়ে। দুই বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি কফির পেয়ালা হাতে আলাপরত। দুজনেই কলকাতার যাত্রী। একজন কলকাতা ফিরছেন রাজস্থান থেকে নিজের পরবর্তী ছবির লোকেশন দেখে। আরেকজন আসছেন কলকাতায় ওস্তাদ আলি খাঁ সঙ্গীত সম্মেলনে, ঐ দিনেরই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। একজন ৪০১ প্লেনের যাত্রী। অপরজন ৪০১/এ-র। দীর্ঘ পনেরো বছর পরে মুখোমুখি দেখা দুজনের। দুজনেই খুব খুশি।

সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কানে এল দুই শিল্পীর কথোপকথন। যিনি রাজস্থান থেকে ফিরছেন তিনি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, আপনারা বাইরে গিয়ে যখন বাজান, তখন কি আলাপের অংশটাকে একটু ছেঁটে ছোটো করে দেন? কালো ওভারকোটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চকচকে চৌকো একটা বাকসো। ডালা খুলে তুলে নিলেন একটা বিড়ি। অল্প একটু-খানি ধোঁয়া ছেড়ে স্মিত প্রসন্ন হাসিতে মুখখানা বাড়িয়ে নিয়ে উত্তর দিলেন যিনি, তিনি কলকাতায় আসছেন সেতার বাজাতে। — না, না, একেবারেই নয়। বিশেষ করে ধরুন জার্মানি বা ফ্রান্সে, আপনি শুনলে অবাক হবেন, একঘণ্টা পনেরো থেকে দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত আলাপ করেছি। করেছি মানে বুঝতে পারছি, এই আলাপ আরো কুড়ি মিনিট বাড়িয়ে দিলেও, দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনবে। তা ছাড়া আজকাল বিদেশি শ্রোতারা অনেক বেশি সচেতন। কোন রাগ কেমন, তাল, বোল, মীড়ের কাজ এ সব বেশ ভালোই বোঝে। ধরুন, ইউনিভারসিটির ছাত্ররা একঘণ্টার একটা লেকচারে ডাকল। কী রকম সব প্রশ্ন করে জানেন।

একজন ছাত্র প্রশ্ন করল, আচ্ছা এই যে বাজাতে বাজাতে 'ইমপ্রোভাইজ' করেন, এটা কী করে সম্ভব? কী রকম জটিল প্রশ্ন ভেবে দেখুন।

আলাপ গড়াতে গড়াতে চলে গেল রাজস্থানে। কথা উঠল ওখানকার ফোক টিউন, ফোক ইনসট্রুমেন্ট নিয়ে। দু-জনেই একমত যে ওখানকার প্রত্যেকটা সাধারণ মানুষও এক একজন ওস্তাদ বাজিয়ে। এবং এমন সব সাধারণ বাজনা ওখানে ঘরে ঘরে বাজে, যার গভীরতা ভোলা যায় না?

পাশ থেকে জনৈক দিল্লিপ্রবাসী বাঙালি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, খাঁ সাহেব, আপনি দিল্লিতে বাজান না কেন? আবার মুখে সেই প্রসন্ন হাসি। কিন্তু পান-চিবানো ঠোঁটের ফাঁকে এবং প্রশস্ত কপালে একটুখানি যেন বিদ্রুপের ছায়া।

—বাজাই না, কারণ বাজনা শোনার সমঝদার লোকের অভাব, তাই। দিল্লি থেকে মাঝে মাঝে ডাক যে আসে না তা নয়। সাড়া জাগে না মনে। কিন্তু কলকাতা থেকে ডাক এলেই যে ছুটে যাই, তার কারণ, কলকাতার মানুষ গান বাজনার সত্যিকারের সমঝদার। অনেকরকম রাজনীতির ঝড়, গণ্ডগোল, ঘটে গেছে তবু কলকাতার মানুষ গান-বাজনাকে ভালোবাসতে ভোলেনি। একবার কী হয়েছিল বলি। মোরাদাবাদের একজন নামজাদা শিল্পী, তবলায় খুব গুণী আর্টিস্ট, কলকাতায় এসেছেন। ঘরোয়া একটা অনুষ্ঠান ডেকেছি। হাজার খানেক টাকাও তুলেছি দু-চার টাকার টিকিট বেচে। অনুষ্ঠানের দিন সেই শিল্পী হঠাৎ মন্তব্য করে বসলেন, কলকাতার আদমিরা বে-রস। গান-বাজনার তালিম পাওয়া লোকজন সংখ্যায় বড়ো কম। কথাটা বুকে বাজল। আমার একটা বদ অভ্যাস আছে। আমি গ্রিনরুমে কথা বলি না। স্টেজে বলি। সেদিন করলাম কী, অনুষ্ঠানের আগে স্টেজে উঠে সেই শিল্পীকে বললাম, আসুন আপনার সঙ্গে কলকাতার কিছু 'ছোটোখাটো' আর্টিস্টদের আলাপ করিয়ে দি। এরা সব খুবই 'ক্ষুদ্র শিল্পী।' এই বলে জ্ঞানবাবুকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনে স্টেজে বসিয়ে দিয়ে বললুম, বাজান তো ঘোষ সাহেব। তরপর ঘোষ সাহেবের আধঘণ্টার বাজনা শুনে, সেই শিল্পী তো লজ্জায় লাল। কফি কর্নার থেকে হাত সাতেক দূরে বাকসো বন্দি হয়ে পড়ে আছে একটা লম্বা সেতার। কফি পান শেষ। দুই শিল্পী ঘুরে তাকালেন বিমানবন্দরের দিকে। তখনো কুয়াশা কাটেনি। গান থেকে আলোচনা ফিরে এল যানবাহনের সমস্যায়। যিনি রাজস্থান থেকে ফিরছেন তিনি বললেন, এরকম কিছুদিন চললে, সব তো থেমে যাবে। এই জের টেনে, যিনি সেতারী, বললেন, আর বলেন কেন। দেরাদুন থেকে দিল্লি এলাম, পেট্রোল খরচ পড়ল আগের চেয়ে চার গুণ বেশি। হঠাৎ রোদের ঝলকে ধূসর বিমানবন্দর রুপোলি হয়ে উঠল। দুই শিল্পী ঘুরে তাকালেন সেই রোদের দিকে।

যাক, রোদ উঠল তাহলে। ওঁরা দু-জন এগিয়ে গেলেন নিজেদের বিশ্রামের আসনের দিকে। মাইক কথা বলে উঠল। হ্যাঁ, প্লেন ছাড়বে। তবে বেশ বিলম্বে।

বিমানবন্দরে অপেক্ষমান এই দুই যাত্রীর একজন সত্যজিৎ রায়, আরেকজন ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ।

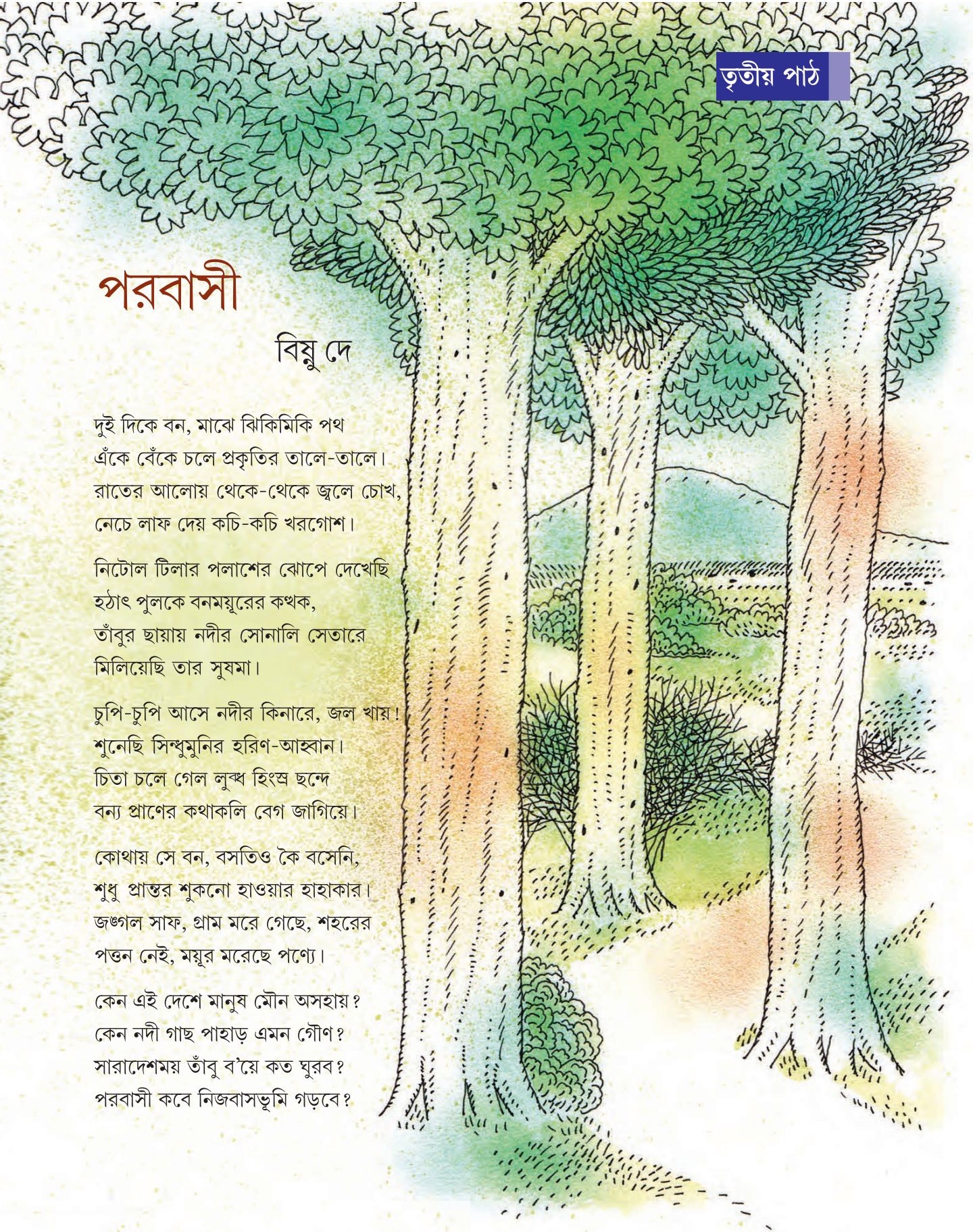

পরবাসী

বিষ্ণু দে

দুই দিকে বন, মাঝে ঝিকিমিকি পথ
এঁকে বেঁকে চলে প্রকৃতির তালে-তালে।
রাতের আলোয় থেকে-থেকে জ্বলে চোখ,
নেচে লাফ দেয় কচি-কচি খরগোশ।

নিটোল টিলার পলাশের ঝোপে দেখেছি
হঠাৎ পুলকে বনময়ূরের কত্থক,
তাঁবুর ছায়ায় নদীর সোনালি সেতারে
মিলিয়েছি তার সুষমা।

চুপি-চুপি আসে নদীর কিনারে, জল খায়!
শুনেছি সিন্ধুমুনির হরিণ-আহ্বান।
চিতা চলে গেল লুব্ধ হিংস্র ছন্দে
বন্য প্রাণের কথাকলি বেগ জাগিয়ে।

কোথায় সে বন, বসতিও কৈ বসেনি,
শুধু প্রান্তর শুকনো হাওয়ার হাহাকার।
জঙ্গল সাফ, গ্রাম মরে গেছে, শহরের
পত্তন নেই, ময়ূর মরেছে পণ্যে।

কেন এই দেশে মানুষ মৌন অসহায়?
কেন নদী গাছ পাহাড় এমন গৌণ?
সারাদেশময় তাঁবু ব'য়ে কত ঘুরব?
পরবাসী কবে নিজবাসভূমি গড়বে?

হাতে কলমে

বিষ্ণু দে (১৯০৯—১৯৮২) : আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই কবি কলকাতার বিখ্যাত শ্যামাচরণ দে বিশ্বাসের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ *উর্বশী ও আর্টেমিস* ১৯৩২ খিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা অন্যান্য বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে — *চোরাবালি, পূর্বলেখ, সন্দ্বীপের চর, অন্বিষ্ট, নাম রেখেছি কোমলগান্ধার, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ, সেই অন্ধকার চাই, উত্তরে থাকো মৌন* প্রভৃতি। *রুচি ও প্রগতি, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, সাহিত্যের দেশ বিদেশ, মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা* তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। তিনি অজস্র বিদেশি কবিতার অনুবাদ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে *এলিঅটের কবিতা, হে বিদেশী ফুল, আফ্রিকায় এশিয়ায় মুরলী মৃদঙ্গ তূর্যে* প্রভৃতি গ্রন্থ।

১.১ কবি বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

১.২ তাঁর লেখা দুটি প্রবন্ধের বইয়ের নাম লেখো।

২. **নিম্নরেখ শব্দগুলির বদলে অন্য শব্দ বসিয়ে অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো। প্রথমটি করে দেওয়া হলো :**

২.১ দুই দিকে বন, মাঝে ঝিকিমিকি পথ
দুই দিকে বন, মাঝে আলোছায়া পথ

২.২ এঁকে বেঁকে চলে প্রকৃতির তালে তালে।

২.৩ তাঁবুর ছায়ায় নদীর সোনালি সেতারে

২.৪ হঠাৎ পুলকে বনময়ূরের কত্থক,

২.৫ বন্য প্রাণের কথাকলি বেগ জাগিয়ে।

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৩.১ পথ কীসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে?

৩.২ চিতার চলে যাওয়ার ছন্দটি কেমন?

৩.৩ ময়ূর কীভাবে মারা গেছে?

৩.৪ প্রান্তরে কার হাহাকার শোনা যাচ্ছে?

৩.৫ পলাশের ঝোপে কবি কী দেখেছেন?

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর কয়েকটি বাক্যে লেখো :**

৪.১ জঙ্গলের কোন কোন প্রাণীর কথা কবি এই কবিতায় বলেছেন?

৪.২ সেতারের বিশেষণ হিসেবে কবি 'সোনালি' শব্দের ব্যবহার করেছেন কেন?

৪.৩ কত্থক ও কথাকলি-র কথা কবিতার মধ্যে কোন প্রসঙ্গে এসেছে?

৪.৪ ‘সিন্ধুমুনির হরিণ-আহ্বান’ কবি কীভাবে শুনেছেন?

৪.৫ ‘ময়ূর মরেছে পণ্যে’ এই কথার অন্তর্নিহিত অর্থ কী?

৫. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৫.১ বিরামচিহ্ন ব্যবহারের দিক থেকে কবিতাটির শেষ স্তবকের বিশিষ্টতা কোথায়? এর থেকে কবি-মানসিকতার কী পরিচয় পাওয়া যায়?

৫.২ কবি নিজেকে পরবাসী বলেছেন কেন?

৫.৩ ‘জঙ্গল সাফ, গ্রাম মরে গেছে, শহরের/পত্তন নেই...’ — প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কেরপরিপ্রেক্ষিতে এই পঙ্‌ক্তিটির প্রাসঙ্গিকতা বিচার করো।

৫.৪ ‘পরবাসী’ কবিতার প্রথম তিনটি স্তবক ও শেষ দুটি স্তবকের মধ্যে বক্তব্য বিষয়ের কোনো পার্থক্য থাকলে তা নিজের ভাষায় লেখো।

৫.৫ ‘পরবাসী’ কবিতাতে কবির ভাবনা কেমন করে এগিয়েছে তা কবিতার গঠন আলোচনা করে বোঝাও।

৫.৬ কবিতাটির নাম ‘পরবাসী’ দেওয়ার ক্ষেত্রে কবির কী কী চিন্তা কাজ করেছে বলে তোমার মনে হয়? তুমি কবিতাটির বিকল্প নাম দাও এবং সে নামকরণের ক্ষেত্রে তোমার যুক্তি সাজাও।

শব্দার্থ : কথাকলি — কেরলের ধ্রুপদি নৃত্যশৈলী। নিটোল — সুগোল। কত্থক — জয়পুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস ঘরানার নৃত্যশৈলী। সুষমা — শোভা, সৌন্দর্য। লুব্ধ — লোলুপ, লোভী।

৬. টীকা লেখো :

কত্থক, সেতার, কথাকলি, সিন্ধুমুনি, পণ্য

৭. নীচের শব্দগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার করো :

জ্বলে, পরবাসী, চলে, তাঁবু

৮. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো :

নিটোল, বনময়ূর, সিন্ধুমুনি, নিজবাসভূমি, সেতার

৯. নীচের শব্দগুলি কীভাবে গঠিত হয়েছে দেখাও :

সোনালি, আহ্বান, বন্য, বসতি, পরবাসী

১০. নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো :

১০.১ চুপি চুপি আসে নদীর কিনারে, জল খায়। (সরল বাক্যে)

১০.২ নিটোল টিলার পলাশের ঝোপে দেখেছি। (জটিল বাক্যে)

১০.৩ চিতা চলে গেল লুব্ধ হিংস্র ছন্দে বন্য প্রাণের কথাকলি বেগ জাগিয়ে। (যৌগিক বাক্যে)

১০.৪ কেন এই দেশে মানুষ মৌন অসহায়? (না-সূচক বাক্যে)

১১. যে-কোনো দুটি স্তবকের মধ্যে বিশেষ্য ও বিশেষণ-এর ব্যবহার কবি কীভাবে করেছেন, দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

পথচল্‌তি

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ব্যাপারটা খুব সম্ভবত ১৯২৮ সালে শীতকালে ঘটেছিল— বছর আর তারিখটা ঠিক-মতন মনে পড়ছে না। শ্বশুরালয় গয়া থেকে ফিরছি। দেহরা-দুন এক্সপ্রেস ধরব। সঙ্গে একখানি মধ্যম শ্রেণির রিটার্ন টিকিটের ফিরতি অংশ আছে।

ইস্টিশানে পৌঁছে দেখলুম, ট্রেন যথাকালে এল, কিন্তু কেন জানি না, গাড়িতে সেদিন অসম্ভব ভিড় দেখলুম। মধ্যম শ্রেণির কোনো কামরায় তো ঢুকতেই পারা যায় না, দ্বিতীয় শ্রেণির গাড়িগুলিতেও লোকে মেঝেতে বিছানা করে নিয়ে, কোথাও বা বসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সমস্ত ট্রেনটা একবার ঘুরে দেখবার মতলবে ইঞ্জিনের দিকে চলেছি, এমন সময় দেখি, একটা বড়ো তৃতীয় শ্রেণির 'বগি'র কাছে একেবারেই লোকের ভিড় নেই। গিয়ে দেখি, এই বিরাট গাড়িখানি গুটিকতক কাবুলিওয়ালার দখলে। কেউ সেখানে গেলে, বা জানালা দিয়ে উঁকি মারলে, হুংকার ছাড়ছে—'ইয়ে গাড়ে তোমারা ওয়াস্তে নেহি—জো তুম উদর।' জবরদস্ত চেহারার কাবুলিওয়ালারা এই হুংকার দ্বারা লোক ঠেকিয়ে রাখছে। রেলের কর্মচারী বা পুলিশ এর ত্রি-সীমানাতেও ঘেঁষছে না।

তখন ঠিক করলুম, এই গাড়িতেই ঢুকব, আর ওখানেই জায়গা করে নেব। আমার সাহস হচ্ছে খালি এইজন্য যে, আমি দু-চারটি ফারসি কথা বলতে পারি। ফারসি হচ্ছে আফগানিস্তানের শিক্ষিতজনের ভাষা, উচ্চ ও ভদ্রসমাজের ভাষা, সরকারি ভাষা। অন্তত তখন তা-ই ছিল। কাবুলিওয়ালা পাঠানদের মাতৃভাষা পশতুর সম্মান তখন ছিল না। একে তো পশতুভাষী লোকেদের মধ্যে শিক্ষা আর সংস্কৃতির অভাব, আর তার উপরে তাদের ভাষায় সাহিত্যও তেমন নেই। আমার মনে হলো, এদের মধ্যে ফারসি বলাটা যখন একটা শিক্ষা আর আভিজাত্যের লক্ষণ, তখন আমি যদি এদের সঙ্গে ফারসিতে দুই-একটা কথা বলি, তাহলে এরা প্রথমত একটু হকচকিয়ে যাবে, বাঙালিবাবুর মুখে ফারসি শুনে, আর তারপরে তারা হয়তো আমার জন্য জায়গাও করে দিতে পারে। জবরদস্ত আর মারমুখী হলেও আমি জানি যে এই পাঠানদের মধ্যে আবার একটু শিশুসুলভ ভাবও আছে।

সোজা গিয়ে গাড়ির হাতল ধরে—দরজাটা আধখোলা ছিল—আরো টেনে খুলে, ভিতরে ঢুকতে যাব, এমন সময় পাঁচ-ছয়জন গুরুগম্ভীর স্বরে হুংকার দিয়ে উঠল—'কিদর আতে হো? ইয়ে গাড়ে তুম লোগ কে ওয়াস্তে নেহি, সির্ফ হম পঠান-লোগ ইসমেঁ জাতে হৈঁ।' আমি এর জবাব দিলুম ফারসিতে—'ম-রা জগহ্ বি-দেহ্, বরারে সির্ফ য়ক আদমি।' অর্থাৎ, আমাকে জায়গা দাও, খালি একজন মানুষের জন্য। যা অনুমান করেছিলুম—ওরা একটু যেন হতভম্ব হয়ে গেল। একজন আমার কথা বুঝতে না পেরে বললে—'ক্যা মাঙ্গতা?' আমি আবার ফারসিতে বললুম—'ফারসি ন-মী-দানি? ফারসি ন-মী-গোয়ি?' অর্থাৎ, ফারসি জানো না? ফারসি বলতে পারো না? খুব সম্ভব এদের মধ্যে ফারসি-জানা লোক ছিল না। তখন আমি নিজের গলাটা চড়িয়ে একটু উপহাসের সঙ্গে তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বললুম—'অজ চি তর্ফ-ই-অফঘানিস্তান মী-আদমি, কি দর-জবান-ই-ফারসি গুফৎ-গূ কর্দনে, তাকৎ-ই-শুমা নীস্ত?' —আফগানিস্তানের কোন অঞ্চল থেকে আসছ যে ফারসিতে কথা বলবার ক্ষমতা তোমাদের নেই? যখন তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে, তখন গাড়ির ভিতর থেকে একটি ছোকরা বললে—'ম্যান ফওরসি মী-দওনম; চি খাহি?' অর্থাৎ আমি ফারসি জানি—কী চাও? আমি উত্তর দিলুম—'মন

গুফ্‌তা বুদম্—ম-রা জগহ্ বি-দেহ্।' —আমি তো বললুম, আমাকে জায়গা দাও। তখন সে জিজ্ঞাসা করলে—'কুজা মী-রভী?' —অর্থাৎ কোথায় যাবে? জবাব দিলুম—'দর শহর কলকত্তা বি-রভম।' —কলকাতা শহরে যাব।

তখন পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। ইশারায় দলের অনুমতি পেয়ে, ফারসি-বলিয়ে ছোকরাটি বললে— '—ব্যালে, অ্যান্দর বি-অও'—আচ্ছা, ভিতরে এসো। আমি ভিতরে ঢুকতেই, সেই বিরাট 'বগি'র একটা পুরো বেঞ্চি এরা খালি করে আমাকে ছেড়ে দিলে। তার সঙ্গে একটুখানি সমীহ করার ভাবও ছিল, যেন এক মস্ত আলেম এসেছেন। ইতিমধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিলে।

কিন্তু গুরুবলে রক্ষা পেলুম; বুঝতে পারা গেল, এরা সবাই হচ্ছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ আর Pathan Tribal Area অর্থাৎ ইংরেজদের অধীনস্থ পাঠান উপজাতি অঞ্চলের লোক, খাস কাবুলির মতন সাধারণত এরা ফারসি জানে না। এটা আমার পক্ষে ভারি সুবিধার আর স্বস্তির কথা হলো, কারণ ওদের সঙ্গে বাকি যা আলাপ হলো, প্রায় সবই হিন্দুস্থানিতে, আর বাংলায়। দুই-একজন মাঝে-মাঝে এক-আধ লবজ ফারসি বললে বটে, কিন্তু এদের বিদ্যেও বেশি দূর এগোল না।

ট্রেন চলছে। চারদিকে বেশ করে তাকিয়ে নিলুম, প্রায় ষোলোজন পাঠান মর্দ এই গাড়ির যাত্রী। সমস্ত গাড়িখানা বাসি কাপড়-চোপড়, দেহের ঘর্ম আর তার সঙ্গে হিং-এর উগ্র গন্ধে ভরপুর। এই অপূর্ব সৌরভের সংমিশ্রণ—কড়াভাবে আমার নাসারন্ধ্রকে আক্রমণ করলে।

একটুখানি দূরে, উপরের বাংকের উপরে শয়ান একটি বৃদ্ধ পাঠান, আমাকে ঢুকতে দেখে, শোয়া অবস্থা থেকে উঠে খাটন-মালা হয়ে আসন নিয়ে বসেছিল—টঙের উপর থেকে আমাকে নিবিষ্টচিত্তে দেখে একটুখানি

পরে জিজ্ঞাসা করলে—'বাবু, বাংলাদেশের থুন নি আইছ—তুমি কি বাংলাদেশ থেকে এসেছ?' আমি জিজ্ঞাসা করলুম—'আগা-সাহেব, তোমার ব্যবসা কোথায়? বাংলাদেশে তোমার ডেরা কোথায়?' বৃদ্ধ পাঠানটি বললে—'পড়ুয়াহালি। বাবু, দান নি বালো অইছে—ধান ভালো হয়েছে কি?' বুঝলুম, আগা-সাহেবের ব্যবসা হচ্ছে শীতবস্ত্র আর হিং বিক্রি করা, আর চাষিদের টাকা ধার দেওয়া। বাংলার পল্লি অঞ্চলে, বরিশালের পটুয়াখালি বন্দরে তাঁর কেন্দ্র। পরে তাঁর সঙ্গে কথা বললুম—দেখলুম, তিনি বরিশাইল্যা ভাষা তাঁর মাতৃভাষার মতনই বলতে পারেন, কলকাতার ভাষা তাঁর আয়ত্ত হয়নি। একজন পাঠান একটু আরতি করে আমায় বললে—'বাবু, তুম ডরো মৎ, অগর কোই পুছেগা কি তুম বাঙ্গালি পাঠানোঁকি গাড়ি মেঁ বরকে কাহে সৈর করতে হো, তো হম লোগ বোলেগা, উও হমারা বাবু হৈ, হমারা হিসাব লিখতা হৈ।' তার দরদ দেখে খুশি হলুম—যাতে আমি সগৌরবে এদের সঙ্গে চলতে পারি, এদেরই যেন একজন হয়ে, সেইটি তাদের ইচ্ছে।—আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে কলকাতার 'কাবুলি ব্যাংক'-এর হিসাবনবিশ কেরানি বা ম্যানেজারের মর্যাদা দিলে।

আমি বললুম—'তোমরা কেউ খুশ-হাল খাঁ খট্টকের গজল জানো?' খুশ-হাল খাঁ খট্টক হচ্ছেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ের মানুষ, পাঠানদের পশতু ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাতে একটি পাঠান, যে উপরের বাংকে বসে ছিল, ভারি খুশি হলো, আর উৎসাহিত হয়ে উঠল। সে বললে—'খুশ-হাল খাঁ খট্টকের গজল শুনবে? বাবু, দেখছি তুমি আমাদের সব খবর-ই জানো, আমি তোমাকে শোনাচ্ছি।' এই বলে সে পাঠান কবি খুশ-হাল খাঁ খট্টকের পশতু ভাষায় রচিত গজল ধরলে। ভাবের আতিশয্যের সঙ্গে, কখনো-কখনো কানে হাত দিয়ে, কখনও বুকে হাত দিয়ে, গানের কলি গাইতে লাগলেন। তারপর, ঢাকের বাদ্যি থামলেই যেমন মিষ্টি লাগে, তাঁর গান থামল।

আমি তখন অতি সহজ আর সরলভাবে বিষয়ান্তরের অবতারণা করলুম—'বহুৎ খুব, বাহবা বেশ; ধন্যবাদ। পশতু গজল তো শোনালে; এখন আদম খান আর দুরখানির মহব্বতের কিসসা কেউ জানো?' তাতে পাঠানদের একজনের খুব উৎসাহ হলো। বললে—'কী বলছ বাবু, আদম খাঁ দুরখানির কিসসা শুনবে? এ তো দিল-ভাঙা কাহিনি। আমি তোমাকে শোনাচ্ছি।' এই না বলে সে আবার তার কর্কশ যদিও গুরুগম্ভীর কণ্ঠে এই কিসসা, কতকটা গান করে আর কতকটা পাঠ করে যেতে লাগল।

এইভাবে আমরা দেহরা-দুন এক্সপ্রেসের সেই থার্ড ক্লাস গাড়িখানিতে যেন এক পশতু-সাহিত্য-গোষ্ঠী বা সম্মেলন লাগিয়ে দিলুম।

আমার সামনের বেঞ্চিতে দুই পাঠান সহযাত্রী নিজেদের ভাষায় আমার সম্বন্ধে আলোচনা করছে, শুনলুম। পশতু ভাষা বুঝি না, কিন্তু এই ভাষায় প্রচুর ফারসি আর আরবি শব্দ আছে, কাজেই উর্দুটা একটু জানা থাকলে অনেক শব্দ বুঝতে পারা যায়, আর তার সাহায্যে, কী বিষয়ে আলাপ হচ্ছে সেটা বুঝতে দেরি হয় না। এরা ভারি বিদ্বান আর বুদ্ধিমান; দেখছ না, ইংরেজদের লেখা সব বই পড়ে আর ফারসি পড়ে, এই বাবু আমাদের সম্বন্ধে কত খবর জানে, মায় আমাদের খাস দেহাতি কথাও কত জেনে নিয়েছে।

পাঠান দেশে পাঠানদের মধ্যে একটি বাঙালি ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতার কথা কোনো বাংলা মাসিক পত্রে — বোধহয় 'প্রবর্তক' পত্রিকায় অনেকদিন আগে পড়েছিলুম, সে-কথা মনে হচ্ছে।

পাঠানদের প্রায় প্রত্যেকেই ক্রমে এক-একটি বেঞ্চ বা বার্থ দখল করে শোবার চেষ্টা করলে। তখন রোজার সময়। সকলেই আগে সান্ধ্য আহার সেরে নিয়েছিল। এই রাত্রে আমারও বেশ ভালো ঘুম হলো। এদের সঙ্গে থেকে, গাড়ির ভিতরকার সৌরভে আমার নাসিকাটিও ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তার পরের দিন খুব ভোরেই উঠে দেখি, এদের মধ্যে কেউ-কেউ উঠে নমাজ পড়ছে, আর সারাদিন রোজার উপোস করতে হবে বলে খুব ভোরে ভরপেট খেয়ে নিচ্ছে—বড়ো-বড়ো পাঠান 'রোটা' আর কাবাব। পটুয়াখালির বৃদ্ধ আগা-সাহেবকে দেখি, অনেক আগেই উঠে বসে তসবিহ বা মালা জপ করছেন—'নব্বদ্-ও-নও অসমা-ই-হাসানা' অর্থাৎ আরবি ভাষায় ঈশ্বরের নিরানব্বুইটি পবিত্র ও সুন্দর নাম, মালার এক-একটি দানা গুনে-গুনে আবৃত্তি করা হয় নীরবে। আমার ঘুম ভাঙতে আর তার সঙ্গে চোখাচোখি হতে, তিনি আমাকে 'সুখসৌপ্তিক' প্রশ্ন শুধালেন, —'বাবু, কাইল রাইতে একটু কাইত হইবার পারছিলা?' অর্থাৎ কাল রাত্রে একটু কাত হতে বা নিদ্রা দিতে পেরেছিলে? এই প্রশ্নটি যে স্বাভাবিক ভদ্রতাপ্রণোদিত সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে আমাদের গাড়ি বোধহয় আসানসোলে এসে পড়েছে।

এইভাবে যথাকালে কলকাতাতে এসে পৌঁছলুম। গাড়ির ভিড়ের কথা চিন্তা করলে বলতে হবে, বেশ ভালোই এলুম, আর ক্ষণিকের সহযাত্রী ভিন্নজাতির বন্ধু কতকগুলির সঙ্গ-সুখও লাভ হলো। তাদের কারো সঙ্গে আর ভবিষ্যতে কখনও দেখা হবে না,—অন্তত বোধহয় এভাবে নয়—কিন্তু এই রাতটির কথা খুব ভালোভাবেই আমার মনে আছে।